

পরিমল গোস্বামী

বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা-৪

বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ,
২৫।২, মোহন বাগান রো কলিকাতা-৪ হইতে
শ্রীশক্তিকুমার ভাদুড়ী কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ,
শ্রাবণ, ১৩৬২ (ইং জুলাই ১৯৫৫)

মূল্য : আড়াই টাকা মাত্র

জয় হিন্দ্ প্রিন্টিং এণ্ড বাইণ্ডিং ওয়ার্কস, ৪২, আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা ৯ হইতে শ্রীনিত্যগোপাল চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত

প্রথমে উপাসনাসম্পাদক শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের ও পরে বঙ্গশ্রীসম্পাদক শ্রীসজনীকান্ত দাসের সঙ্গে সহ-অস্তিত্ব নীতিতে প্রথম বিশ্বাসী সহ-সম্পাদক, আমার সাহিত্য-কর্মের প্রথম উৎসাহদাতা ও পরে সমস্ত লেখার বিরুদ্ধাচারী সাহিত্যসীমানাত্যাগী সুহৃৎঃ

শ্রীকিরণকুমার রায়কে

পৌরপ্রতিষ্ঠানের প্রচার ভ্যানে গুরু বিষয় প্রচারের ফাঁকে ফাঁকে অকারণ কতকগুলো হাল্কা গানের রেকর্ড বাজাতে হয় শ্রোতার সংখ্যা বাড়াবার জন্য। আমার এই বইতেও মাত্র তিন চারিটি গুরু বিষয় অবতারণার জন্য কুড়ি বাইশটি হাল্কা গানের রেকর্ড বাজাতে হয়েছে ঐ একই উদ্দেশ্যে।

বইয়ের নাম রেখেছি একখানি ফরাসী বইয়েব অনুকরণে। নামকরণ সমস্যা উগ্র হওয়ার মুহূর্তে হঠাৎ মনে পড়ল। লেওঁ-পোল ফার্গ রচিত বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ—'দি ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন'। বইখানা রূপ অ্যাণ্ড কোং (Rupa & Co.)-র মালিক বিশ্বগ্রন্থমহাসমুদ্রে ভাসমান শ্রীমেহরা গত ১৯৫৩ সনে আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। এই ফরাসী বইখানাতেও বিচিত্র রস রচনা।

নামসমস্যার সমাধান হল, কিন্তু নির্ভুল মুদ্রণসমস্যার সমাধান পাইনি।

কলিকাতা — পরিমল গোস্বামী

১৮-৭-৫৫

সূচিপত্র

আরও ম্যাজিক চাই ১
লেজকাটা শিয়ালের কথা ৫
মেয়েরা কথা গোপন রাখতে পারে না কেন ১০
বিশেষণ ও বাঙালী ১৫
অসম্পূর্ণ প্রকাশ ২২
মিথ্যাচাবের বিদ্যা ২৬
মহাবিদ্যার জগৎগুরুর উদ্দেশে ... ৩২
ধূম্রদর্শন ৩৫
বিজ্ঞাপন ৩৯
গালুডি ৪৩
রবীন্দ্রশিল্প প্রসঙ্গ . . ৪৮
আমার দেখা শিশিরকুমার ভাদুড়ি ৬০
ধূমকেতুব উদ্দেশে খোলা চিঠি . . ৬৮
মহাত্মাজি, ঘড়ি ও বৃটিশ জাতি . .. ৭৪
জাগিল কি ঘুমালো সে ৭৭
প্রতিবাদ ৮৮
হাসিব উপকরণ ৯২
তারা ও আমরা ৯৫
ফ্যাশান ৯৯
আঁধারে আলো ১০৩
রবীন্দ্রনাথেব নৌকায় ১০৬
প্রগতি ও দেশলাই . ১১২
স্বর্ণঘটিত . . ১১৪
বিজয়ার নমস্কার . . ১১৮

আরও ম্যাজিক চাই

হঠাৎ কলকাতা শহরের উপর একটা প্রচণ্ড ম্যাজিকের আক্রমণ চলেছে কিছুদিন থেকে। দেশী বিদেশী জাদুকর দল একের পব এক প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়াচ্ছেন এবং খবরের কাগজে সিনেমা-থিয়েটার আলোচনা পৃষ্ঠায় ম্যাজিক সম্পর্কেও নিযমিত আলোচনা চলছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ম্যাজিকের প্রতি অকস্মাৎ অতি সাংঘাতিকভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে সবাই। মানে বাংলাদেশে স্বদেশী যুগের পরেই এই যে নতুন যুগ এলো এর নাম ম্যাজিকের যুগ। কথাটা সত্য, কাবণ ম্যাজিকের কতকগুলো খেলার সঙ্গে আজকেব দিনের রীতি অনেকাংশে মিলে যায।

এ যুগে নানা জাতীয সমস্যা যেমন অতি ভযঙ্কব হযে দেখা দিয়েছে, তার সমাধানও হযেছে তেমনি শক্ত। একমাত্র ম্যাজিকের একটি বড় খেলার মধ্যেই এই সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত আছে। চোখ বাঁধা অবস্থায় জাদুকর ভিড়ের মধ্যে সাইকেল চালিযে সেই ইঙ্গিতটি আমাদের মনে সঞ্চাবিত কবেছেন। অর্থাৎ ভিড়ে যেখানে পথচলা প্রায অসাধ্য, দুর্ঘটনা যেখানে অনিবার্য, সেখানে একবার চোখ বাঁধতে পাবলে আর কোনো ভয় নেই। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এর প্রযোগ চলবে এখন থেকে। অন্নবস্ত্র সমস্যাও এতেই মিটবে। বাজাবে দুধ নেই, ঘি নেই বলে আর চিৎকার করতে হবে না, কাপড়ের বাজারে আগুন লেগেছে বলে আর চেঁচাতে হবে না। শুধু একবাব চোখ বাঁধুন। চোখ খুলে এতদিন বৃথাই দুধ খুঁজে বেড়িয়েছেন। সবই দেখেছেন জল। কিন্তু চোখ বাঁধলে দেখবেন খাঁটি দুধের অভাব মিটে গেছে। চোখ খুলে ঘি কিনতে যান পাবেন না। কিন্তু চোখ বাঁধলে দেখবেন ঘিতে বাজার ভর্তি। কাপড়ের বাজারেও তাই। চোখ খুলে ছাপা দাম দেখে কাপড় কিনতে যান, পাবেন না। চোখ বেঁধে ফেলুন। ছাপা দাম দেখতে পাবেন না, কিন্তু কাপড় কেনা সহজ হবে।

স্বদেশী যুগেব সঙ্গে এ যুগেব তফাৎ এই যে, সে সময আমরা ধূলো দিতে চেযেছিলাম ইংবেজের চোখে, এ যুগে ধূলো দিচ্ছি নিজেদের চোখে। আর এ ধূলো একবাব চোখে পড়লে আব ভাবনা নেই, একেবারে মন্ত্রপড়া ধূলো, দিনকে রাত কবতে পাবে এই ধূলো। ম্যাজিকেরও উদ্দেশ্য ঐ একই। সেও দিনকে রাত কবে। যেমন ধরুন একটা দেশালাইয়েব বাক্স। ভিতরে আছে চল্লিশ কাঠি, কিন্তু মন্ত্রপূত

অক্ষরে লেখা আছে ষাট কাঠি। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক ঐ চল্লিশ কাঠিকে ষাট কাঠি দেখছে। এইখানেই শেষ নয়। দেশালাই বাক্সে দাম ছাপা আছে কত জানেন? তিন পয়সা। কিন্তু আমরা সেটাকে দেখছি চার পয়সা এবং দিচ্ছিও তাই। দিনকে রাত করা যেমন বিদ্যা, তিনকে চার করাও সেই রকম বিদ্যা। তাই স্বদেশী মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় আর স্বদেশী ভায়েব দেওয়া ঝুটা কাপড় এখন একই পদমর্যাদাসম্পন্ন। সমস্যা জলের মতো সরল হয়ে গেছে, যেমন হয়েছে দুধের বেলায়। অবশ্য শুধু জলের মতো নয়, জলের দ্বারাও।

রঙ্গমঞ্চে ম্যাজিকের এত আকর্ষণ হবার এটি একটি বড় কারণ। সবাই সেখানে সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত খুঁজতে যায়। কিন্তু ম্যাজিক আসলে কি জিনিস তা জানা দরকার। জানলে আকর্ষণের আরও কারণ আবিষ্কৃত হবে।

ম্যাজিক হচ্ছে যা নয় তাই দেখা। ভুল দেখা। কিন্তু সত্যই কি ভুল দেখা? ভুল দেখা মানে কি? হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের যৌগিকে আমরা ও দুটির কোনো একটি গ্যাসও দেখি না, দেখি জল। তাকে কি আমরা ভুল দেখা বলি? আমরা পৃথিবীকে সমতল দেখি, সে দেখা কি ঠিক? আমরা গ্রহকেও স্থির দেখি, সেও ঠিক দেখা নয়। আমরা একটি গাছকে স্থির দেখি, অথচ গাছ প্রতি মুহূর্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা যে বস্তু নিরেট দেখছি তা নিরেট নয়। তার মধ্যে অনন্ত কোটি পরমাণু পরস্পর বিচ্ছিন্ন হযে বাস করছে। তারও প্রত্যেকটি এক একটি সৌর জগতের মতো, তাদের কেন্দ্রকে ঘিরে বিদ্যুতের গ্রহ-উপগ্রহ ছুটে বেড়াচ্ছে। অথচ আমরা বস্তুকে দেখছি নিরেট। যাকে চলা বলি, প্রধানত তা অনেকগুলি স্থির জিনিসের পরস্পর অবস্থান মাত্র। সিনেমা সেটি বুঝতে পেরে অনেক ছবির পাশাপাশি অবস্থানকে পর্দায় সচল ক'রে তুলল। দিগন্ত রেখার ঊর্ধ্বে যে অস্তগামী সূর্যকে দেখছি, সে আগেই অস্তগত হয়েছে কেননা আমরা যখন তাকে দেখছি তখন সে আড়ালে সরে গেছে। যাকে দেখছি তা সূর্যের ভ্রান্তি মাত্র, সূর্য নয়। স্থান ও কাল, দূব ও নিকট, ছোট ও বড়, আলো ও অন্ধকার, জীবন ও মৃত্যু—এদের মতো ভ্রান্তি আর কি আছে? শাস্ত্রে বলেছে সবই মায়া, আধুনিক বিজ্ঞানও তাই বলে। প্রতি মুহূর্তে যার বদল হচ্ছে, একের অস্তিত্ব অপরের অস্তিত্বের অপেক্ষা করছে, তা মায়া ভিন্ন আর কি? বৃহত্তর ক্ষেত্রে সবই মায়া, সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে সবই ধ্রুব। সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে যাকে স্থির দেখছি, ব্যাপক ক্ষেত্রে তার মতো চঞ্চল আর কিছু নেই এবং যে আমি এ সব কথা বলছি সে আমিও মায়া, যদিও এমন উক্তি পরস্পর-বিরোধী এবং দুষ্ট চক্রভুক্ত। মায়া এই অর্থে যে যে-আমি এ রচনা লিখতে শুরু

করেছি সে-আমি এতক্ষণে বদলে গেছে। এরই মধ্যে আমার বয়স আরও বেড়ে গেছে এবং প্রতি মুহূর্তে যাচ্ছে। এই রচনা কিছুদিন পরে পড়লে অবাক হয়ে ভাবব এ কি আমিই লিখেছি ? সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে আমাকে কেন্দ্র ক'রে আমার চারদিকের স্থানকাল এবং আত্মকেন্দ্রিক জগৎসুদ্ধ আমি ছুটে চলেছি, তার স্থান দখল করছে আর একজন—তাব আত্মকেন্দ্রিক জগৎসুদ্ধ। আমাব জগৎ আমার কাছে ধ্রুব, তার জগৎ তার কাছে ধ্রুব, কিন্তু পরস্পরের সম্পর্কে আমবা মাযা।

আমরা বিশেষ অবস্থায যা দেখি তা সত্য দেখি, কিন্তু অন্য অবস্থার সঙ্গে মেলাতে গেলে ধাঁধা লাগে। চোখ তখন বিশ্বাস করতে চায না। যেমন ঐ হাইড্রোজেন অক্সিজেন আব জল। জলের উপাদান দুটি গ্যাস মাত্র, তা ধাবণা করা কঠিন। বৈজ্ঞানিকেরা তাই এককালে জাদুকব রূপে কুখ্যাত হযেছিলেন। জাদুকর প্রস্পেরো বৈজ্ঞানিক ভিন্ন আর কি ?

বাবট্রাণ্ড বাসেল বলেছেন ইউরোপে একাদশ শতাব্দীতে জ্ঞান লাভেরই অপব নাম ছিল জাদুক্ষমতা লাভ কবা। সে সময দ্বিতীয পোপ সিলভেস্টার বই পড়তেন, শুধু এই অপবাধেই লোকেব সন্দেহভাজন হযেছিলেন। তাদের মতে তিনি শযতানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন কবেছিলেন। ফ্রান্সিস বেকনের মতে বৈজ্ঞানিকেরা জাদুকরদেব চেযেও বড় জাদুকব। কিন্তু কথাটি ঠিক নয। বড় জাদুকর হচ্ছে প্রকৃতি। তারই রহস্য ফাঁস কবছে বৈজ্ঞানিক, উল্টো জাদু দেখিযে। বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে জবাবদিহি করতে হযেছিল লোকের ভ্রান্তিকে উল্টে দেবার অপরাধে। কিন্তু আজ আব কেউ আমরা বৈজ্ঞানিকদের জাদুকর মনে করি না, আজ তাঁদেরই উল্টো-জাদুতে আমরা সকল রহস্যের খোলশ ভেঙে ফেলছি। বিজ্ঞানের কল্যাণে ধীরে ধীরে আমাদের কল্পনায় গড়া রহস্যময জগৎ ধ্বংস হয়ে ক্রমশই রূঢ় বাস্তব প্রকাশিত হযে পড়ছে। চাঁদ আর সোনার চাঁদ নেই, দুরবীণ লাগিযে মাটির চাঁদ দেখছি। সূর্যদেবকে দেখছি জ্বলন্ত গ্যাসরূপে। এইভাবে একের পর এক আমাদের জীবন থেকেও যেন সব বিস্ময় কেটে যাচ্ছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের জীবনকে যতটা স্বাদহীন করেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে চোরাকারবারীরা জুটে তাব চেয়ে বেশি করেছে। তারা সংসারে যে নির্মম অভাব সৃষ্টি কবেছে তার ফলে আমাদের মধ্যেকার শ্রদ্ধেয লোকেরাও অনেকে নীতিজ্ঞান হারিযে ফেলেছেন। এমনকি খদ্দর-বাসের নিচে জুয়াচোরেব অজ্ঞাত বাসের সন্ধান পাওযা যাচ্ছে।

এমনি অবস্থাই তো ম্যাজিকের অনুকূল। অর্থাৎ এই ম্যাজিকপ্রীতির মধ্যেই

দেখি আমরা জীবনের হৃত-রহস্য পুনরুদ্ধারের দাবী। নির্মম বাস্তবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি, আবার ভ্রান্তি চাই। হাঁস মুরগী থেকে গোনা ডিম চাই না, শূন্য টুপি থেকে অগুনতি ডিম পেতে চাই। শূন্য গেলাস থেকে সরবৎ খেতে চাই। দু ঘণ্টার মধ্যে আমগাছে ফল ফলাতে চাই। কার্যকারণ বিধি (ল অব কজেশন), প্রকৃতির সমব্যবহারিতা (ইউনিফরমিটি অব নেচার) প্রভৃতিতে মন বিদ্রোহ করতে চাইছে। অসহ্য বোধ হয় ও সব কথা যখন স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আইন নামক কোনো বস্তুই সমাজ জীবনে আর টিঁকছে না। সামাজিক হোক, রাষ্ট্রীয় হোক, যখন সকল আইনের ব্যর্থতা দেখছি প্রতিটি ক্ষেত্রে তখন প্রকৃতির আইন স্মরণ করার মধ্যে আনন্দ কোথায় ?

তাই আমরা আইনও চাই না, আইনস্টাইনও চাই না ; আমরা ম্যাজিক চাই এবং আরও ম্যাজিক চাই। (১৯৫০)

লেজকাটা শেয়ালের কথা

মানুষের সীমানা থেকে খাবার চুরি করতে গিয়ে বৃদ্ধ শেয়ালের লেজটি গেল কাটা। কিন্তু শেয়ালের সমাজে ইউনিফর্মিটির বড় দাম, তাই সে তার লাঙ্গুল-হীনতার বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমাজে মিশতে বড়ই শঙ্কিত হয়ে পড়ল। তার পক্ষে ঘর থেকে বাইরে যাওয়াই হল এখন মুশকিল।

শেয়ালের মাথায় এক বুদ্ধি এলো। সে এক সভায় তার সমাজের সকল শেয়ালকে ডেকে বলল, "লেজ আমাদের দেহের একটা বাহুল্য অংশ মাত্র, লেজ রাখায় আমাদের কিছুমাত্র সুবিধা নেই, বরঞ্চ অসুবিধা আছে, এবং এইটে বুঝতে পেরেই আমি স্বয়ং লেজ কেটেছি এবং আমি অনুরোধ করি তোমরাও সকলে নিজের নিজের লেজ কেটে ফেল।"

ভাষা অত্যন্ত সহজ, আবেদন অত্যন্ত সরল, এবং এই আবেদন শুনে উপস্থিত শেয়ালেরা ভাবতে লাগল তাদের কি করা উচিত। তাদের মধ্যে এক অতি বুদ্ধিমান শেয়াল ছিল, সে বলে উঠল, "আপনার কথা মানতে রাজি আছি, কিন্তু একটি কথা। লেজ আমাদের দেহের এক বাহুল্য অংশ বটে, কিন্তু এতকাল তো আমরা এটা বিনা প্রতিবাদে বহন ক'রে এসেছি।"

লেজকাটা শেয়াল বলল,"এতকাল বহন করাটাই লেজ রাখার পক্ষে একমাত্র যুক্তি হতে পারে না। বিনা বিচারে যা বহন করা সহজ, বিচার করতে গেলে তা বহন করা সহজ না হতে পারে। আমি বিচার করেই ত্যাগ করতে বলছি, এবং বিচার করেছি বলেই ত্যাগ করতে ভাল লাগছে।"

চতুর শেয়াল বলল," ত্যাগ করা কঠিন নয় একথা মানছি, কিন্তু আরও একটি কথা আছে। এখন না হয় ত্যাগ করলাম, কিন্তু কাল যদি ওটা আবার হঠাৎ দরকার হয়ে পড়ে তখন পাব কোথায়?"

কথাটা জ্ঞানবানের কথা, সবাই শুনে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল; লেজ কাটার সমস্যা থেকে আপাতত তারা মুক্তি পেল; উপরন্তু এই সময়ে একটি নবাগত শেয়াল সেই সভায় ঢুকে হঠাৎ ফাঁস ক'রে দিল যে বৃদ্ধ শেয়াল আপন ইচ্ছায় লেজ কাটেনি, বেকায়দায় পড়ে মানুষের হাতে তার লেজ কাটা গেছে।

এই নবাগত শেয়ালটি শেয়াল-সমাজের গুপ্তচর। সে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে সব খবরই জেনে ফেলেছে।

খবরটি শোনামাত্র সভাস্থ শেয়ালেরা ব্যঙ্গাত্মক হুয়া হুয়া শব্দে সভা কাঁপিয়ে তুলল। বৃদ্ধ শেয়ালের চাতুরিতে ভুলে তারা নিজেদের যে সর্বনাশ করতে যাচ্ছিল সেটা বুঝতে পেরে সমস্বরে তাকে ধিক্কার দিতে লাগল। লাঙ্গুলহীন বৃদ্ধ শৃগাল লজ্জায় মাথা নিচু করল।

একদল তরুণ শেয়াল কিন্তু এই ধিক্কারে যোগ দিল না, তারা গোপনে নিজেদের মধ্যে কি যেন পরামর্শ করতে লাগল। এজন্য অন্য শেয়ালেরা তাদের প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করতে উদ্যত হল। তখন কাল বিলম্ব না ক'রে তরুণ শেয়ালদের মধ্য থেকে একজন উঠে বলল, "আমরা কিন্তু নিজেদের লেজ কাটতে প্রস্তুত, কেননা বৃদ্ধ শেয়ালের লেজকাটা উপলক্ষে আমরা একটি নতুন দৃষ্টি লাভ করেছি।"

"নতুন দৃষ্টিলাভ করেছ! বটে! কি দৃষ্টিলাভ করেছ বল।" লাঙ্গুল-রক্ষীদলের একজন চেঁচিয়ে এই কথাটি বলল।

"যদি সত্যই শুনতে চান, বলছি।" তরুণ শেয়াল গর্বের সঙ্গে মাথা উঁচু ক'রে বলল, "সত্যিই শুনতে চান?"

লাঙ্গুলরক্ষী দল বলল, তারা সত্যিই শুনতে চায়। তখন তরুণ শেয়াল একটা কাটা গাছের গুঁড়ির উপর উঠে সবাইকে সম্বোধন ক'রে বলতে লাগল,—

"বড়ই লজ্জার বিষয় যে আমাদের মধ্যে যে শেয়ালটি প্রশ্ন তুলেছে লেজ দরকার হলে পাওয়া যাবে কোথায়, সেই শেয়ালটই বুদ্ধিমান হিসাবে সবার কাছে প্রশংসা পেল, আর আমরা ক'জন তার সঙ্গে মত মেলাতে পারিনি বলে আমরা প্রশংসা পেলাম না! আপনারা যে এমন নির্বোধ হতে পারেন তা আমরা ভাবতেই পারিনি।"

ভিড়ের ভিতর থেকে প্রশ্ন উঠল: "কেন?—আমরা নির্বোধ হলাম কেন?"

তরুণ শেয়াল বলতে লাগল, "শুনুন, কেন। যিনি লেজ হারিয়েছেন তাঁর কথা আপনারা ভেবে দেখুন। নিরাপদে এবং নিশ্চিন্ত মনে কোনো শেয়ালই খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না। শেয়াল দেখলে হয় মানুষ না হয় কুকুর তাকে তাড়া করে। নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে তাকে মনুষ্যশাসিত পৃথিবী থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়, এমন অবস্থায় একটি শেয়ালের লেজ যদি কোনো মানুষের হাতে কাটা যায় তা হলে শেয়াল সমাজে তার জন্য একটু অনুকম্পা কেউ প্রকাশ করবে না, উল্টে আরো সবাই তাকে বিদ্রূপ করবে, এটা বড়ই নিষ্ঠুরতা। এই নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছেন আপনারা। বিদ্রূপের হাত থেকে বাঁচার জন্যই হৃতলাঙ্গুল বৃদ্ধ শেয়াল আমাদের সবাইকে তাঁর দুঃখের অংশ গ্রহণ করতে বলেছিলেন। আপনারা যদি

তাঁর কথায় লেজ কাটতে রাজি হতেন তা হলে বোঝা যেত শৃগাল-সমাজে সমবেদনার অভাব নেই। কিন্তু আপনারা রাজি হলেন না।"

আবার প্রশ্ন হ'ল: "সমবেদনা দেখানোর জন্য লেজ কাটতে হবে, এ কেমন কথা?"

তরুণ শেয়াল বলতে লাগল, "লেজই কাটতে হবে, কেননা লেজ একটি সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। সংস্কারকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকার প্রবল ইচ্ছা আমাদের শত্রু মানুষের মধ্যেও আছে। যে লেজ নিজের বিদ্যাবুদ্ধিতে উপার্জিত নয়, উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পাওয়া, সমাজের তাতে বিশেষ উপকার নেই। আমরা আমাদের শত্রু মানুষের মধ্যে কি দেখছি? জন্ম থেকেই মানুষ সামাজিক শ্রেণীভেদের লেজ লাভ করে। এই লেজ-গৌরব তাদের উপার্জন করতে হয় না, তাকে রক্ষা করতেও কোনো পরিশ্রম করতে হয় না—অথচ এরই জোরে তারা বহু লোককে অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় মানুষের সমাজ আমাদের সমাজ অপেক্ষা উন্নত বলে তাদের মধ্যে অনেকে স্বেচ্ছায় লেজ কেটে ফেলেছে। আভিজাত্য যাদের মনের ধর্ম, লেজ তাদের অদৃশ্য। এ ধর্ম মনে না থাকলেই বাইরে লেজরূপে প্রকাশ পায়—সুতরাং তা কেটে ফেলাই বিধেয়। এই যুক্তিতে মানুষের মধ্যে যদি কেউ বলে লেজ কেটে ফেল, তা হলে তাদের মধ্যে সে কথা মান্য করার লোকের অভাব হয় না, তারা প্রশ্ন করে না দরকার হলে পাব কোথায়? মন যখন জীবন্ত থাকে তখন এ প্রশ্নই মনে জাগে না।"

সভাস্থ শেয়ালেরা তরুণ শেয়ালের কথায় আকৃষ্ট হল। আগে তারা কিছু গোলমাল করছিল, এতক্ষণে তাদের গোলমাল সম্পূর্ণ থেমে গেছে। তরুণ শেয়াল উৎসাহভরে বলতে লাগল, "আসল কথা, যে মুহূর্তে মনে হবে লেজ অবান্তর, সেই মুহূর্তে সেটা কেটে ফেলাই ভাল। যারা কাটে না তারা সমাজের চোখে ধুলো দিয়ে তাদের কৃত্রিম আভিজাত্যটাই বজায় রাখতে চায়। এটা হচ্ছে জড় মনের জীর্ণ বিলাস। আর এরাই হচ্ছে চতুর বৃদ্ধের দল। কিন্তু যারা ইঙ্গিত পাবামাত্র লেজ কেটে ফেলে তারা হচ্ছে তরুণ। তাদের মন জীবন্ত। মানুষের সমাজে লেজ কাটার পরীক্ষা বারবার হয়ে গেছে এবং তাতে তাদের কোনো লোক্‌সান ঘটে নি। মানুষ দেখেছে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের প্রধান বাধা হচ্ছে ঐ লেজ। মানুষের মিলনের মধ্যে যাঁরা এই বাধা দূর করেছেন তাঁরাই আমাদের আদর্শ—তাঁরাই আমাদের নমস্য।"

লেজকাটা বৃদ্ধ শেয়ালটি এতক্ষণ এই তরুণ শেয়ালের বক্তৃতায় অভিভূত হয়ে পড়েছিল ; সে এতক্ষণ কি বলে তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে ভেবে পাচ্ছিল না—এইবারে সে ধীরে ধীরে তরুণ শেয়ালের কাছে এগিয়ে আসতে লাগল।

তরুণ শেয়াল লেজকাটা শেয়ালের দিকে তাকিয়ে আরও উচ্ছ্বসিতভাবে বলতে লাগল, "দেখুন আপনারা, এঁর দিকে চেয়ে দেখুন। যিনি বলেছিলেন লেজ কাটলে লেজ কোথায় পাব, তিনিও দেখুন। আপনারা লেজের গর্বে কি বিদ্রূপই না এঁকে করেছেন। এই নিষ্ঠুরতার হাত থেকে বাঁচার জন্যই কত সঙ্কোচের সঙ্গে কাটা-লেজের মূল ভাগটা কোনো রকমে ঢেকে রেখে ভয়ে ভয়ে সভায় বসে লেজকাটার প্রস্তাব ইনি করেছিলেন। ইনি জানতেন, যদি ইনি আপনাদের লেজকাটায় রাজি করতে না পারেন তা হলে এঁর বেঁচে থাকা হবে মৃত্যুরই সমান। এঁর চরিত্রে যদি কিছু চাতুরি প্রকাশ হয়ে থাকে তবে তা এই ভয় থেকেই জন্মেছিল। ইনি আপনাদেরই একজন, অথচ একমাত্র লেজের অভাবেই ইনি এক মুহূর্তে পর হয়ে গেলেন!—অথচ ভেবে দেখুন, আমাদের লেজ থাকুক বা না থাকুক, মানুষের হাতে আমরা সমান মার খাই!"

বক্তৃতায় সভার সকল শেয়াল সমানভাবে নিজেদের নির্বুদ্ধিতার জন্য লজ্জিত হয়ে উঠল এবং বলল তারা সবাই এখন তাদের ভুল বুঝতে পেরেছে। একজন বলল, তারা নিজেরা অবিলম্বে লেজ কাটতে পারবে না, তবে যারা কাটবে তাদের সঙ্গে তারা কোনো রকম অসামাজিক ব্যবহারও করবে না।

লেজকাটা শেয়ালটা এতক্ষণ কাটা লেজ দেখাতে লজ্জিত হচ্ছিল, এ কথার পর আর তার কোনো সংকোচই রইল না, সে সাহস ক'রে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু কতক-গুলো শেয়াল তার লেজের দুর্দশা দেখে হাসি সামলাতে পারল না, আর কতকগুলো শেয়াল তাতে চটে গিয়ে তাদের তাড়া ক'রে নিয়ে গেল সভার বাইরে। যারা বসে রইল তারা বলল, "ওরা বোধহয় আর ফিরবে না, কেননা ওরা এখনও তরুণ শেয়ালের যুক্তি ঠিকমতো হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি, তাই ছল ক'রে সরে পড়ল।"

তরুণ শেয়াল বলল, "ওরা গিয়ে তা হলে ভালই করেছে, কেননা আমাদের সমাজে ওদের দিয়ে কোনো দিন কোনো কাজ হবে না।"

এর পর তরুণ শেয়ালরা লেজকাটার জন্য প্রস্তুত হল এবং অবশিষ্ট প্রবীণ শেয়ালেরা তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করল, এবং অবশেষে তারাও নিজেদের লেজ কাটতে চাইল। তখন তরুণেরা বলল, "আপনাদের সবারই হাতে-কলমে সহানু-ভূতি দেখাতে হবে এমন কোনো কথা নেই, আপনাদের আন্তরিকতায় আমরা মুগ্ধ

হয়েছি, আপনাদের কাছ থেকে এই আন্তরিকতাটুকু পেলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, আপনাদের আর লেজ কাটতে হবে না।"

বৃদ্ধেরা খুশি হয়ে বলল, "তোমরা যথার্থ তরুণধর্মী, তোমাদের হাতে আমাদের লেজও বাঁচল, মানও বাঁচল, তোমাদের জয় হোক।" (১৯৪০)

মেয়েরা কথা গোপন রাখতে পারে না কেন

মেয়েরা কথা গোপন রাখতে পারে না, এই পরম উত্তেজনাপূর্ণ গুজবটি অনেকদিন থেকে সমাজে প্রচলিত আছে। এটি সত্য কিনা তার কোনো বিজ্ঞান সম্মত পরীক্ষা আজও হয়নি। কিন্তু একথা কি সত্য নয় যে গবেষণাঘরে আধুনিক যান্ত্রিক পরীক্ষা না করেও অনেক সত্য আমরা পেয়ে থাকি? বহুদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য অনেক ক্ষেত্রেই যে বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী নয় তা আমরা জানি। মেয়েরা যে কথা গোপন রাখতে পারে না এ অভিজ্ঞতা আমাদের পুরাতন। রাম কোনো মেয়েকে একটি গোপন কথা বলেছিল, মেয়েটি সেই দিনই সেকথা তার এক বান্ধবীর কাছে গিয়ে বলেছে। শ্যামেরও সেই অভিজ্ঞতা। যদু মধুরও ঐ একই অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ সত্য, হঠাৎ উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

মেয়েদের এই অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিদেশীরাও একমত। এক ইংরেজ রসিক ব্যক্তি বলেছেন মেয়েরা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লিখতে পারে না, কেন না তারা অপরাধীর নাম প্রথম অধ্যায়েই বলে ফেলে, অনেকে নাকি প্রথম প্যারাগ্রাফেই।

আবার এ কথার প্রতিবাদও সেই দেশেই হয়েছে। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস সম্পর্কে প্রধান প্রতিবাদ হচ্ছে শ্রীমতী অ্যাগাথা ক্রিস্টির পঞ্চাশ খানা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। তিনি এ বিষয়ে অনেক পুরুষ লেখককে হার মানিয়েছেন। তাঁর লেখায় অপরাধীর নাম শুধু যে শেষ পর্যন্ত গোপন থাকে তাই নয়, এমন ভাবে গোপন থাকে যে শেষ অধ্যায়ে না পৌছানো পর্যন্ত অপরাধী যে কে তা অনুমান করাই সম্ভব হয় না।

কিন্তু ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের কথা থাক, নিজের জীবন দিয়ে যে সব মেয়ে এ কথার প্রতিবাদ ক'রে গেছেন তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। আমাদের দেশে যে সব মেয়ে স্বাধীনতার জন্য এককালে লড়াই করেছেন তাঁরাও কখনো গোপন কথা শত্রুপক্ষের কাছে প্রকাশ করেননি, যারা করেছে তারা বিপরীত সম্প্রদায়ের।

মার্কিন লেখক হথর্নের "দি স্কার্লেট লেটার"-এর নায়িকা সমাজপতিদের কাছে হীনতম লাঞ্ছনা সহ্য করেও তার গোপনতম কথাটি প্রকাশ করেনি। নারী চরিত্রের সঙ্গে তার ব্যবহারের যে কোনো অসঙ্গতি আছে এমন কারো মনে আসে না।

"গৃহপ্রবেশ" নাটকের মাসি সত্য গোপনের যে স্নেহমধুর দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন তাও নারীচরিত্রের বিপরীত এমন কথা কেউ মনে করে না।

প্রতিপক্ষ বলবে মেয়েরা নিজের কথা গোপন রাখতে পারে অন্যের কথা পারে না। যদি বলা যায়—তা যদি সত্য হয় তা হলে রবীন্দ্রনাথের এই গানটির কি অর্থ দাঁড়াবে ?—

তোমার গোপন কথাটি সখী রেখো না, মনে
শুধু আমায় বল গোপনে।

নিজের কথা গোপন করাই যদি মেয়েদের বৈশিষ্ট্য হয় তা হলে এত বড় একটা অর্থহীন অনুবোধ কেন? তা হলে তার উত্তর সম্ভবত এই হবে যে অনুরোধটি আর কিছুই নয়, নিজেকে ভোলানো মাত্র। সখীকে নানা ভাবে তোয়াজ করার মধ্যেই ওর মাধুর্য। সখী গোপন কথাটি বলবে জানলে ওটা আব গান হত না। কিংবা এমনও হতে পাবে যে "তোমার গোপন কথাটি" মানে তুমি আজ সব চেয়ে সরস যে গোপন কথাটি সংগ্রহ ক'বে এনেছ সেইটি, আব অনুবোধেব অর্থ এই যে সেটি তুমি বিনা অনুরোধেই বলবে জানি, এবং বলবে বলেই ছুটে এসেছ জানি, কিন্তু প্রতিদিন তোমাব কাছে সবার গোপন কথা শুনে শুনে তোমার স্বভাব সম্পর্কে আমার ধারণা কিছু নিচু হয়েছে, তাই অনুরোধরূপ ছলের আশ্রয় নিচ্ছি। যেন তুমি আপনা থেকে বলতে না, যেন আমার অনুরোধেই বলছ এবং তাতে তোমার সম্পর্কে আমার ধারণা আর নিচু হবে না।

এ ব্যাখ্যা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তা ভিন্ন এ কথাটাও ভেবে দেখবার তো যখন শুনি মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র ক্লাব হওয়া উচিত নয়, কেননা ওরা একসঙ্গে মিললে প্রত্যেকের ঘরের খবর সেখানে প্রকাশ হয়ে পড়বে।

এ ধারণার মুলে কি কোনোই সত্য নেই?

নিন্দুকেরা বলে সত্য আছে। আরও বলে মেয়েবা যে নিজের কথাটি গোপন রেখে অন্যের কথা প্রকাশ করে, এটি তাবা স্বয়ং প্রকৃতি দেবীর কাছ থেকে পেয়েছে। প্রকৃতিও তার আসল সত্যটি প্রকাশ করে না—বাইরে বাইরেই অনেক কিছু প্রকাশ ক'রে থাকে।

কিন্তু নিন্দুকের এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য নয়। অন্তত যে ভাবে কথাটি বলে সেভাবে সত্য নয়। কিন্তু মেয়েদের সম্পর্কে শুধু কথা প্রকাশ করা নয়, ব্যথা প্রকাশ করা সম্পর্কেও অভিযোগ আছে। ও দুটোব মধ্যে অবশ্য কোনো তফাৎ নেই প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে। অর্থাৎ মেয়েদের হৃদয় এমন ধাতুতে গড়া, যাতে, কথা বা ব্যথা যাই হোক যদি সমান উত্তেজনা সৃষ্টি করে, তা হলে তাদের হৃদয়ে ও দুটোর কোনোটারই

স্থান হয় না। এটাই হল সাধারণ নিয়ম। অবশ্য এই নিয়ম থেকে পুরুষেরাও সম্পূর্ণ মুক্ত নয়, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। মেয়েদের হৃদয় যখন উত্তেজিত হয় তখন তাতে আলোড়ন হয় অত্যন্ত বেশি। যে-কোনো বেদনা বা যে-কোনো সরস গোপন কথায় মেয়েদের হৃদয়-নীরে সমুদ্রমন্থনের ক্রিয়া শুরু হয়, আর তার ফলে ভিতর থেকে একে একে সব বেরিয়ে আসতে থাকে। হঠাৎ আঘাত পেলে তাই তারা যেমন অস্থির হয়, যেমন চিৎকার ক'রে কাঁদতে থাকে, পুরুষদের বেলায় সে রকম হয় না। হঠাৎ আঘাত মেয়েদের সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্মহত্যা করা তাদের কাছে সহজ। তীক্ষ্ণ বেদনাকে তারা পুরুষের মতো মনের বাইরে বিস্তার ক'রে ধরতে পারে না, তার সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই করতে থাকে। ব্যথা ও কথা দুইই তাদের হৃদয়ে কাঁটার মতো বিঁধে যায়, তার পর হয় সে কাঁটার কাছে ষোল আনা হার মানে, না হয় তা তৎক্ষণাৎ উপড়ে ফেলে দেয়, এবং তাতে যে ক্ষতচিহ্ন অঙ্কিত হয় জীবনে আর সেদিকে ফিরে তাকাতে সাহস করে না। কথার বেলায় এই উপড়ে ফেলাই হচ্ছে গোপন কথা প্রকাশ করা। শ্যামাকে যখন তার সহচরী বলেছিল

সখী ও তুই নীরবে থাকিস
তোর প্রেমেতে আছে যে কাঁটা
তারে আপন বুকে বিঁধিয়ে রাখিস।

তখন সে অবশ্যই জানত কতবড় মিথ্যা অনুরোধ সে করছে। পরের জন্য সংগৃহীত কাঁটা নিজের বুকে বেঁধাবে এ কেমন কথা? কারণ প্রচলিত মত এই যে, মেয়েরা নিজেদের যে আঘাত দেওয়া উচিত তা অপরকে দেয়। কারণ তারা জানে পুরুষ তা নীরবে সহ্য করবে। এ ধারণা সত্য। শুধু তাই নয়, বেদনাকে পুরুষেরা সাহিত্য বা আর্টের বিষয়বস্তু করতে পারে। যে বেদনা কীট্‌স্‌-এর লেখনীতে জ্বালা হয়ে ফোটে, শেলীর কলমে ঝড় তোলে, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে গান হয়ে ফোটে; কালিদাস যে বেদনায় নিজে না কেঁদে শকুন্তলাকে কাঁদান, শেক্সপিয়ার যে বেদনায় নিজে উন্মাদ না হয়ে ওথেলোকে হ্যামলেটকে লীয়রকে উন্মাদ করেন, দুঃখ বেদনা সম্পর্কে সেই শিল্পীজনোচিত নিস্পৃহতার নিদর্শন মেয়েদের মধ্যে কদাচিৎ মেলে। তার কারণ বাইরে তাদের যত সঞ্চয়ই থাক (বলা বাহুল্য জুয়েলারির), অন্তরে তারা কোনো কঠিন সঞ্চয়ই রাখতে পারে না। আর্ডেনের অরণ্যে রোজ্যালিণ্ড তো স্পষ্টই বলেছিল—

"Do you not know I am a woman? when I think, I must speak."

কারণ চাপল্যই মেয়েদের স্বভাব ধর্ম। এর কারণ প্রকৃতি থেকেই এমন ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হয়েছে যে মেয়েদের দায়িত্ব পুরুষদের মতো বহুব্যাপক হবে না। তাই তারা স্রোতস্বিনীর সঙ্গে তুলিত হয। সব সময় কুলুকুলু শব্দে বয়ে চলেছে কথার বুদ্বুদ ফুটিয়ে। তাই তারা পুরুষের অনুগত হতেও ভালবাসে। গলায় মালার মতো দুলে দুলে বেড়ায়। সে মালাটি যার গলায় শোভা পায দায়িত্ব যে তার দুখানি পাযেরই বেশি সে কথা না বললেও চলে। দুলে বেড়ানোব উপমা থেকেই তাদের স্বভাবচাপল্যের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। গল্প প্রচলিত আছে একদল মেয়ে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের কাছে উপস্থিত থাকায পুরুষেরা উক্ত বৃহত্তম প্রপাতেব শব্দ ভাল ক'রে শুনতে পায়নি। আর একটি গল্পে জানতে পারি এক স্বামীর স্বরভঙ্গ হযেছিল, কিন্তু তার স্ত্রী তা বুঝতে পাবে তিন দিন পরে। ঐ তিন দিনের মধ্যে স্বামী আর কথা বলার সুযোগ পায নি। শোনা যায, এক স্বামী ঘুমেব মধ্যে কথা বলত, স্ত্রী অনুযোগ করাতে স্বামী সখেদে বলেছিল, কথা তো বলতে হবে কোনো না-কোনো সময ?

এই জাতীয় সব গল্পের উৎপত্তি অহেতুক নয়। মেয়েদের যে ওটাই স্বভাব, অর্থাৎ তাবা অনর্গল কথা বলাব ঝোঁকে নানা গোপন কথা প্রকাশ ক'রে ফেলে। যেখানে পাবে না সেখানে তাবা মরে।

নারী ও পুরুষেব এই হল মোটামুটি চেহাবা। অর্থাৎ মেয়েদের বেলায় যা একান্ত বাস্তব ও ব্যক্তিগত, পুরুষেব বেলায তাব অনেক খানিই অর্ধ-বাস্তব এবং নৈর্ব্যক্তিক। মেযেরা দুঃখে আত্মবিসর্জন দেয়, পুরুষেরা দুঃখ থেকে দূরে স'রে এসে তাকে বাইরে থেকে দেখতে চেষ্টা করে। তার মানে নিজেদেব সম্পর্কে মেয়েরা নিষ্ঠুর হতে পাবে না। তারা অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক। তাবা যে সহজে আত্মবিসর্জন দেয় সেও নিজের প্রতি অতিমমত্ববশতই। যে তীক্ষ্ণ বেদনার আঘাতে মেযেরা ভেঙে পড়ে, সে বেদনায পুরুষ ভেঙে পড়ে না, সে সেই বেদনাকে মনের জারক রসে জীর্ণ করতে থাকে। তীব্রতম বেদনাকে সে সমস্ত জীবনেব মধ্যে বা শিল্প সৃষ্টির মধ্যে সঞ্চারিত করতে থাকে। নীলকণ্ঠ একমাত্র শিবেব পক্ষেই হওয়া সম্ভব।

ব্যক্তিগত বহু নির্মম আঘাত বেদনা পার হয়ে একমাত্র পুরুষ কবিই বলতে পারেন—

নয়নের জল গভীর গহনে আছে হৃদয়ের স্তরে
বেদনার রসে গোপনে গোপনে সাধনা সফল করে।

মেয়েদের কিন্তু কোনো অশ্রুই গভীর গহনে থাকে না, সবটাই বেরিয়ে আসে চোখের পথে। আর পুরুষদের যে সব অশ্রুই গোপন থাকে তার ইঙ্গিত আছে ঐ গানে।

তুলনা করলে অবাক হতে হয় কত দিনের গভীর ক্ষত অন্তরের নিভৃত দেশে লুকিয়ে থেকে কবির সমস্ত সাধনায় রস সঞ্চার করেছে। তার ছিঁড়ে গেছে কত বার, কিন্তু তা নিয়ে হাহাকার নেই, তবু তার মধ্যে সুর লেগেছে জীবনে। হাসিকান্না মিলিয়ে বিচিত্র যে জীবন, কবি পুরুষোচিত ধর্মেই তাকে মেনে নিয়েছেন।

বুকের শিরা ছিন্ন করে ভীষণ পূজা করেছি তোরে
কখনো পূজা শোভন শতদলে
বিচিত্রা হে বিচিত্রা
হাসিতে কভু কখনো আঁখিজলে।

বুকের শিরা ছিন্ন করা বেদনায় উর্ধ্বে উঠে এমন সহজ সুরে গান গাইবার ভাগ্য কি মেয়েরা কখনো পেয়েছে?

কিন্তু পায়নি বলেই হয় তো সংসার চলছে এমন সহজ ভাবে। পুরুষ ও নারীর মধ্যে এই যে বৈপরীত্য এটি বিরোধ নয়; একজন চুপ ক'রে থাকে, একজন কথা বলে বেড়ায়—এই দুই বৈপরীত্য মিলিয়ে সংসারে একটি ঐকতান বেজে চলেছে। ধনাত্মক আর ঋণাত্মক বিদ্যুতের গতিচক্র সম্পূর্ণ হলে যেমন আলো জ্বলে এও ঠিক তেমনি। নারী ও পুরুষের এই বৈচিত্র্যই মানুষের জীবনকে এমন সুন্দর করেছে। সুতরাং নিন্দুকদের সঙ্গে আমিও সুর মেলাচ্ছি। উপরন্তু বলছি মেয়েরা যেন স্পেকট্রামের যে দিকে অতি-বেগুনি সেই দিকের বাসিন্দা, আর পুরুষেরা লাল উজানি দিকের। প্রথম প্রান্তের তরঙ্গ হ্রস্ব, চপলতা বেশি; দ্বিতীয় প্রান্তের তরঙ্গ দীর্ঘ, গাম্ভীর্য বেশি। প্রথম প্রান্তে মেয়েরা যে অদৃশ্য আলো বিকিরণ করে তার মূলে স্নিগ্ধতা, আর দ্বিতীয় প্রান্তে পুরুষেরা যে অদৃশ্য আলো বিকিরণ করে তার মূলে উত্তাপ। মেয়েদের অন্তরে আগুন জ্বললে তা তারা তৎক্ষণাৎ চোখের জলে নিবিয়ে ফেলে, আর না হয় তাইতে পুড়ে মরে, কিন্তু পুরুষের অন্তরের আগুন নেবে না, আর তার অশ্রুও চোখে ঝরে না, আগুনের প্রতিবেশীরূপে অন্তরেই বাস করে।

কিন্তু এত প্রমাণ সত্ত্বেও একথা লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি যে মেয়েরা কেন কথা গোপন রাখতে পারে না আমি জানি না। এ বিষয়ে বিধাতার মতোই আমি সমান অজ্ঞ।

(১৯৫১)

বিশেষণ ও বাঙালী

বাংলা ভাষায় কোনো একটি বস্তু বা ভাবেব বিভিন্ন অবস্থা প্রকাশক শব্দ সংখ্যা যেমন কম, তেমনি গুণের বিভিন্ন স্তরের তারতম্য প্রকাশক বিশেষণের সংখ্যাও কম। বাংলা ভাষায় শব্দের এই দৈন্য বাঙালীর চরিত্রকে কি ভাবে প্রভাবান্বিত ক'রে তার বিচার বুদ্ধিকে পঙ্গু ক'বে রেখেছে তা ভাবলে অবাক হতে হয়।

বিশেষণের দৈন্যই সব চেয়ে বেশি ক্ষতিকর। বাংলা ভাষায় বিশেষণ এত কম যে মাত্র সেই ক'টিকে সম্বল ক'রে আমবা আধুনিক কালের শিল্প ও সাহিত্যেব বিচিত্র ভাবধারাকে বুঝতে ও বোঝাতে কষ্ট বোধ করি। বোঝার দরকার হলে ইংরেজী ভাষার উপর নির্ভর করছি এবং বোঝানোর সময় বাংলা বিশেষণেব পাশে তার যথার্থ ইংরেজী প্রতিশব্দটিকে বন্ধনীভুক্ত ক'রে সমস্যা সমাধানেব চেষ্টা করছি। কিন্তু সব ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না। রচনা লেখাব সময যদি বা হয়, বক্তৃতা দেবার সময বার বাব ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করা চলে না। ইংরেজী nice, fine, elegant, beautiful, excellent, splendid, superb, grand, exquisite, magnificent প্রভৃতি শব্দের অর্থগত যে স্তর-ভেদ আছে, তারতম্য আছে, বাংলায ঠিক সে রকম নেই। এবং ইংবেজীতে এত বেশি বিশেষণ থাকা সত্ত্বেও ইংরেজ লেখক তৃপ্ত নন। ইংবেজীতে আরও বেশি বিশেষণের অভাব অনেকেই অনুভব করেছেন। অবশ্য একথা ঠিক যে গুণের প্রত্যেকটি স্তরের তফাতেব জন্য একটি ক'রে বিশেষণ থাকলে ভাষা আবও ভারাক্রান্ত হত, এবং তা ভাব প্রকাশে সাহায্য না ক'রে হয তো বাধাই সৃষ্টি করত। কিন্তু তবু প্রগতিশীল বিশ্লেষণী যুগে ইংরেজী ভাষায় শিল্প সাহিত্য নিয়ে যে ভাবে আলোচনা করা যায়, যে ভাবে তার সকল দিক বিচার করা যায়, বাংলা ভাষায় তা অবশ্যই করা যায না।

বাংলা ভাষায় বিদেশী বিশেষ্য শব্দ অনেক নেওযা হযেছে এবং ভবিষ্যতেও নিতে হবে, কিন্তু বিশেষণ তো ধার করা যায না। বাংলা ভাষার পক্ষে এ এক সমস্যা। এবং এরই জন্য চিন্তাজগতে আমরা ইংরেজী শব্দ, ইংরেজী ভাবচিত্র এবং ইংরেজী চিন্তাভঙ্গির আশ্রয় নিয়ে এক দিকে যেমন

পরনির্ভরতার হীনতা মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছি, অপর দিকে তেমনি আমাদের বিশ্লেষণী বৃত্তি একটা নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ হয়ে এবং অগ্রগমনে শেষ পর্যন্ত প্রতিহত হয়ে আমাদের বার বার ফিরিয়ে আনছে আমাদের স্বভাবসিদ্ধ ভাবপ্রবণতার মধ্যেই।

মনে কথা আছে, কল্পনায় ছবি আছে, অথচ ভাষা নেই—এ অবস্থা সত্যই লজ্জাকর। বাংলা ভাষায় ইংরেজী শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কিত কোনো বিখ্যাত সমালোচনার বইই অনুবাদ করা যায় না। অনুবাদের সময় অনেক জল মিশিয়ে, অনেক সংক্ষিপ্ত ক'রে শ্রেষ্ঠ বাংলা অনুবাদ যা সম্ভব হয়, তা সরলপাঠ জাতীয় বই ছাড়া আর কিছুই নয়। বাঙালী লেখক এ জন্য বুদ্ধিবৃত্ত লেখক হতে পারছে না ইংরেজ লেখকের মতো।

বাংলা ভাষায় আমরা যে সাহিত্যকে অভিজাত সাহিত্য বলে মাঝে মাঝে কটাক্ষপাত করি সেই অভিজাত সাহিত্যই হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্ত সাহিত্য—যদিও পূর্বোল্লেখিত ত্রুটির জন্য স্বভাবতই সকল বাংলা অভিজাত সাহিত্যই ইংরেজী সমালোচনা সাহিত্যের তুলনায় অনেক নিচের ধাপে পড়ে আছে। আমরা অবশ্য বিচার-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের মনের মতো একটা রূপ দিয়ে থাকি, কিন্তু তা ইংরেজী ভাষায় যতখানি পরিপূর্ণতা লাভ করে বাংলা ভাষায় ততখানি করে না।

কিন্তু তবু বাংলা অভিজাত সাহিত্য বলতে আমাদের নাসিকা কুঞ্চিত হয় কেন? হয় তার কারণ অভিজাত সাহিত্য রচনায় বুদ্ধির উপর এবং শব্দ চয়নের নিপুণতার উপর অসম্ভব রকম চাপ পড়ে। এই চাপ যারা সহ্য করে, অথচ সুবোধ্য সাহিত্য রচনা করতে পারে না, তাদের আমরা নির্বোধ ভাবি। কিন্তু বাংলা ভাষায় যদি আমাদের ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে গঠিত ধারণা এবং ছবিকে ফুটিয়ে তোলার উপযুক্ত ক্ষমতা থাকত, তা হলে অভিজাত সাহিত্য রচনায় মনের সক্রিয়তা এবং তৎপরতা শুধু ভাষা চয়ন বা গঠনের চেষ্টার মধ্যেই শেষ হত না। আর তা হলে সে ভাষা তখন সবার বোধগম্যও হত।

একটা উপমা দিই। কোনো নিসর্গ দৃশ্য ছবির বিষয়বস্তু হতে পারে কিনা তা বিচার করতে শিল্পীর প্রয়োজন। কিন্তু সেই দৃশ্য কাগজে ছবি রূপে ফুটিয়ে তুলতে এক শিল্পী ক্যামেরা ব্যবহার করে, আর এক শিল্পী রং তুলি ব্যবহার করে। প্রথমটিতে, ফুটিয়ে তোলার কাজে মানসিক পরিশ্রম কম, দ্বিতীয়টিতে বেশি। এ ক্ষেত্রে দুই পৃথক শিল্পীর কার্যফল কোন্‌টা বেশি সার্থক হল সে

প্রশ্ন না তুলে আমি এই উপমার সাহায্যে এই কথাটি বলতে চাই যে ইংরেজ লেখকের মনে যে কল্পনার ছবি উদয় হয় তার ছাপ সে ক্যামেরার মতো অল্প আয়াসে গ্রহণ করতে পারে। কল্পনার ছবি রূপায়িত করতে মনের যে কাজ, তার সঙ্গে ভাষা গঠন তাকে করতে হয় না, ভাষা তার তৈরি হয়েই আছে। কিন্তু বাংলা লেখককে একই সঙ্গে দুটো করতে হয় এবং তা করেও তার ছবি পূর্ণতা লাভ করে না।

অভিজাত সাহিত্যের ভাষা স্বভাবতই ঘরোয়া ভাষা থেকে কিছু স্বতন্ত্র, কারণ এ সাহিত্য রচনায় নতুন ভাবকে নতুন ভাষা দিয়ে ফোটাতে হয়, অনেক পরিভাষাও ব্যবহার করতে হয়, সে সব শব্দ হয় তো অল্প দিন তৈরি হয়েছে অথচ ব্যাপক ব্যবহারের অভাবে এখনও তা পাঠক-মনে কোনো পরিচিত ছবি জাগায় না— সুতরাং এই সাহিত্য সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য এবং অনেক সময় বিরক্তিকর হতে বাধ্য। সে জন্য বিচার-সাহিত্যে নতুন নতুন শব্দ বা পরিভাষা যদি বা পাঠক-নিরপেক্ষ ভাবে ব্যবহার করা যায়, জনসাধারণের কাছে বক্তৃতা দেবার সময় ব্যবহার করা যায় না। তার কারণ বক্তৃতার উদ্দেশ্য থাকে তড়িৎ গতিতে শ্রোতার মনে প্রভাব বিস্তার করা। লেখকের এ দিক দিয়ে কিছু সুবিধা আছে। কারন সে জানে তার লেখা যে পড়তে চায় সে ধৈর্য ধরেই পড়বে, দুর্বোধ্য হলে চিন্তা ক'রে মর্ম গ্রহণ করতে চেষ্টা করবে। পাঠকদের এই সময় আছে— শ্রোতাদের সময় কোথায়?

তাই আমাদের দেশে দেখা যায়—যে লেখকেরা রচনা লেখার সময় ধৈর্যের সঙ্গে শব্দ গঠন বা শব্দ চয়ন করে, সেই লেখকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সভায় গিয়ে বার বার একই জাতীয় পরিচিত এবং সহজবোধ্য ভাষায় বক্তৃতা দেয়। এর ফলে বক্তৃতার ভাষায় অনেক ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র ভাবপ্রবণতা ফুটে ওঠে—বিচার বা যুক্তির কথা আদৌ থাকে না। এই সব ক্ষেত্রে বক্তা যেমন নিজে ভ্রষ্ট হয় বিচার বোধের আদর্শ থেকে, তেমনি সে শ্রোতাদের শিক্ষা দেয় বিচার-বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে শুদ্ধ মাত্র ভাব-প্রবণতার দ্বারা চালিত হতে। কোনো মৃতব্যক্তির স্মৃতি-সভায় তো বক্তারা সর্বত্রই প্রায় এক ভাষা ব্যবহার করে। সর্বত্র সকল বিভাগের সকল স্তরের লোকের পরিচয়ের একই বিশেষণ। এই জাতীয় সভা সম্পর্কে যার অভিজ্ঞতা আছে তার নতুন ক'রে কোনো স্মৃতি সভায় যাবার দরকার হয় না—অন্তত বক্তৃতা শুনতে তো নয়ই।

স্মৃতি-সভায় স্মরণীয় ব্যক্তি মাত্রেই সত্যদ্রষ্টা, মহাপুরুষ, ঋষি, মহামানব,

মানবপ্রেমিক, দেশপ্রেমিক, ধর্মপ্রাণ, ইত্যাদি ইত্যাদি। কথা উঠতে পাবে— ক্ষতি কি ? এ সব বিশেষণ ব্যবহারে তো এক পয়সা খরচ হয় না. অতএব মৃত ব্যক্তির গুণগানে কৃপণতা প্রকাশ করব কেন ?

এক দিক দিয়ে কথাটা যুক্তিসঙ্গত। কারণ এতে জনসাধারণের সম্মুখে একটা আদর্শ স্থাপন করা হয়। যে দেশের এত লোক সত্যদ্রষ্টা, ঋষি, মহামানব, সে দেশে হয় তো প্রত্যেকেই এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে পারবে। এটা লাভের দিক এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কারণ যে জাতির মধ্যে মহৎ লোকের আবির্ভাব ঘটে না, সে জাতির ভবিষ্যৎ নেই। কিন্তু এর একটা ক্ষতির দিকও আছে। সেটাও জাতীয় ক্ষতি। সে হচ্ছে এই যে এতে জনসাধারণের মধ্যে বিচার ক্ষমতা জাগে না কোনো দিন। বাস্তবের মূল্য তাদের কাছে কমে যায়। যে মৃত ব্যক্তির স্মৃতি সভা হচ্ছে সেই ব্যক্তির কর্মজীবনে, সে সাহিত্য কর্মই হোক, বা রাজনীতি কর্মই হোক, যে কৃতিত্ব তিনি দেখিয়েছেন তার নিজস্ব চেহারা একটা আছে। সে চেহারার একটা মূল্যও আছে। সেটা ঠিক কি, তা লোককে বোঝবার সুযোগ ক'রে দিলে তবেই স্মৃতি-সভার সার্থকতা। আর এই বোঝবার দামই হচ্ছে জাতীয় জীবনে সব চেয়ে বেশি। একজন লেখক মহামানব নাই বা হলেন ? দেশপ্রেমিক আখ্যা নাই বা পেলেন ?

সোনাকে আমরা মূল্যবান ধাতু বলে জানি। কিন্তু তামা, ইস্পাত বা টিন-এর স্মৃতি সভায় যদি তাদের সবাইকে বিশুদ্ধ সোনা বলে গৌরব করি তা হলে সে গৌরব প্রকাশে কিছু খরচ হয় না একথা ঠিক। তাতে বক্তার উদারতা প্রকাশ পায় এ কথাও সত্য। কিন্তু তাতে তামা ইস্পাত বা টিনের নিজস্ব বিশেষ কৃতিত্বের কথাটা চাপা পড়ে। এতে তামা ইস্পাত টিনের কিছু লাভ হল না, কিন্তু যাদের কাছে সব ধাতু সোনা হয়ে উঠল তাদের বাস্তব দৃষ্টির প্রসার পথ তাতে বন্ধ হয়ে গেল।

একটা কথা সব সময়ে মনে রাখা উচিত যে তামা তামা বলেই সার্থক. ইস্পাত ইস্পাত বলেই সার্থক এবং টিন টিন বলেই সার্থক। তামা, ইস্পাত ও টিনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের দাম সোনার বৈশিষ্ট্যের দামের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সমান-মূল্য।

যদি বলা যায় মূলে যখন সব পদার্থই এক, পরমাণুর কেন্দ্রে আঘাত হেনে তার গঠন পরিবর্তিত ক'রে যখন সিসেকে সোনা করা অসম্ভব নয়, তখন সেই মূল সত্যটাকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করলে প্রকারান্তরে সত্য কথাই বলা হয়; তাহলে সে কথা অবশ্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কিন্তু ঐ সঙ্গে এ কথাটাও স্বীকার না ক'রে

উপায় থাকে না যে একটি সত্যও যার দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি এমন মানুষ সংসারে নেই অতএব সংসারের সকল মানুষই সত্যদ্রষ্টা। মানুষকে ভালবাসে না এমন হতভাগ্যও বোধ করি সংসারে কেউ নেই, অতএব সবাই মানবপ্রেমিক। যে মানুষটিকে মূর্খ চাষা বলে ঘৃণা করি, ক্ষেত সম্পর্কে, আবহাওয়া সম্পর্কে তার জ্ঞান আছে সুতরাং সে জ্ঞানী। আবহাওয়ার লক্ষণ দেখে সে ফসলের ভবিষ্যৎ আগে থাকতেই বলতে পারে অতএব সে সত্যদ্রষ্টা।

• সত্য কথা বলতে কি জগতের সকল মানুষেরই সত্যদৃষ্টি, জ্ঞান এবং মানুষের প্রতি অল্পবিস্তর অনুরাগ আছে। কিন্তু তবু আমরা বিশেষণের এ রকম গণতান্ত্রিকতা তো কাজের বেলা স্বীকার করি না। তামাকে তামা বলি, ইস্পাতকে ইস্পাত। শুধু এমন ভাবে বলি যে তামা তামা হওয়াতে হীন, ইস্পাত ইস্পাত হওয়াতে হীন।—একমাত্র সোনাই মহৎ। কাজের ক্ষেত্রে সকল মানুষকে তো সত্যদ্রষ্টা বলি না, মানব প্রেমিক বলি না। বলি না এই কারণে যে ঐ সব বিশেষণ আমরা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করি। তা না হলে যে ডাক্তার আজ রোগীর অবস্থা দেখে কাল তার কি হবে বলতে পারেন তাঁকে ঋষি বলতাম—এবং আলিপুরের আবহাওয়া-বিশারদকে বলতাম মহর্ষি।

ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে ইস্পাতকে ইস্পাত বলি, তার কারণ ইস্পাত কথাটি উচ্চারণ ক'রে সাধারণত আমরা জনতার মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চাই না। কিন্তু স্মৃতি-সভাতে ইস্পাতকে সোনা বলি কারণ সভায় শ্রোতার মনে উত্তেজনা সৃষ্টি একটা প্রধান লক্ষ্য।

গোরুর উপর আমাদের বর্বরোচিত অত্যাচার সর্বজনবিদিত। কিন্তু সভায় গোরুকে দেবতা বলতেই হবে। গিরিশ ঘোষের নাটক সাহিত্য হিসাবে কোন্ শ্রেণীর মর্যাদা পায় তা বিচারকেরা জানেন, কিন্তু সভার বক্তার কাছে গিরিশচন্দ্র শেক্স্পীয়র। উপরন্তু সত্যদ্রষ্টা মানবপ্রেমিক ইত্যাদি। শরৎচন্দ্র মহামানব, সত্য-দ্রষ্টা ঋষি। (সম্প্রতি শরৎ-স্মৃতি উপলক্ষে রেডিও বক্তৃতায় ঐ রকমই শুনেছি।) এ জন্য বক্তাকে ষোল আনা দোষ দেব না। দোষ হচ্ছে বাংলা ভাষার। সভার বক্তারা নিরুপায়। অল্প সময়ে শ্রোতার মনে বিস্ময় জাগাতে হবে, নইলে সভার মর্যাদা থাকে না। শ্রোতারা নব গঠিত বিশ্লেষণী ভাষার সঙ্গে পরিচিত নয়। তা ছাড়া—সভাতেও যদি গোরু গোরুই থাকে, তা হলে কষ্ট ক'রে সভা ডাকার প্রয়োজন কি? সে তো সবাই জানে।

এ এক বিষম দুষ্টচক্র। অর্থাৎ এক দিকে ভাষার দৈন্যবশত আমাদের বুদ্ধিজাত

বিচার এবং যুক্তিকে যথাযথ প্রকাশ করতে পারছি না. অন্যদিকে প্রগতিশীলেরা বিচার বিশ্লেষণী ভাষা গঠনে যেটুকু চেষ্টা করছে তা সাধারণ পাঠক বা শ্রোতার কাছে নতুন বলে অর্থহীন মনে হচ্ছে। আব ঠিক এই কারণেই ধৈর্যহীন হয়ে যেমন লেখক তেমনি বক্তা বার বার পরিচিত ভাষার সংকীর্ণ আশ্রয়েই ফিরে আসছে। আর তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে সমালোচনা বা বিচাব বিশ্লেষণের ভাষাও নতুন পথে এগিয়ে না গিয়ে সাধারণ সেন্টিমেণ্ট প্রকাশ কবেই কর্তব্য শেষ করছে।

এর প্রতিকার লেখক এবং বক্তার হাতেই। তাবা যদি পাঠক বা শ্রোতার মনে তড়িৎগতি বিস্ময় জাগাবার লোভ ছাড়ে, এবং জনপ্রিয়তা হাবাবাব ভয় ত্যাগ ক'বে বক্তব্য বিষয়বস্তুর যথাযোগ্য মূল্য বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়, তাহলে ধীরে ধীরে ভাষাব দৈন্য এবং সেই সঙ্গে বাঙালী চবিত্রেব অযথা ভাবপ্রবণতা কমে আসতে পাবে। এ বিষযে ভযের কোনো হেতুই নেই, কারণ আমাদের দেশে যে কোনো উপলক্ষে যত সভা হয় এত সভা পৃথিবীব আর কোনো দেশে হয না, বিশেষ ক'বে গুণকীর্তন সভা। সেজন্য আমাদেব দেশে বক্তার সংখ্যা যেমন দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে শ্রোতাদের সংখ্যা কমছে ঠিক সেই পবিমাণেই। সুতবাং শ্রোতা-নিবপেক্ষ ভাবে নিজ নিজ আদর্শ বজায় রেখে বক্তৃতা দেওয়া আমাদেব দেশেই সবচেযে সোজা। এবং যেহেতু শ্রোতার সংখ্যার তুলনায় বক্তাব সংখ্যা অনেক বেশি, সেই হেতু সভায মতভেদেব দরুন যদি দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, এবং শেষ পর্যন্ত তাতে হাতের ব্যবহার অনিবার্য হযে ওঠে তা হলেও বিশুদ্ধ মেজরিটির জোরে বক্তারাই জিতে যাবে।

আমাদের দেশে স্মৃতি-সভাই শুধু হয না, জীবিতদের গুণকীর্তন সভাও হয। কৃতী জীবিতদের মধ্যে যাঁরা জীবনের শেষ প্রান্তে পৌছেছেন, দেশের তরফ থেকে তাঁদের অভিনন্দন জানানোর প্রয়োজন আছে, তাঁদের প্রতি দেশের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন আছে। এতে দেশের লোকের সহৃদয়তা এবং সৌজন্য প্রকাশ পায়। কিন্তু সব সময়েই তা আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন। "A little sincerity is a dangerous thing"—বলেছেন এক ইংরেজ লেখক। আন্তরিকতা চাই, কিন্তু উচ্ছ্বাস চাই না। সকল গুণকীর্তনে একই বিশেষণ, সকল সভায একই ভাবোচ্ছ্বাস, সকল ভাষণে চরম গুণবাচক "তম"—অভিনন্দনকাবী এবং অভিনন্দিত কারো পক্ষেই গৌরবের নয়। তা ছাড়া আমাদের সমসাময়িক সাহিত্যিকদের সম্পর্কে সভা করার মধ্যে আরও কিছু সংযম প্রার্থনীয়। সমসাময়িক কালের হাতে অভ্যর্থনা লাভের একটা মূল্য অবশ্যই আছে, তা সেই কালের পক্ষেই গৌরবের, কিন্তু অনেক সময় সাহিত্য রচনার সাধারণ ক্ষমতাকে সাহিত্যের নবযুগ প্রবর্তনের

অতি-মূল্য দেওয়া অতি অগৌরবের। সকল ক্ষমতাবান লেখকের মধ্যেই কিছু নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, কিন্তু তাই বলে ক্ষমতাবান লেখক মাত্রেই যুগ প্রবর্তকের আসনে বসেন না। কোনো দেশেই তা হয় না। কোনো নতুন ভাবধারা দেশের মধ্যে যদি প্রবল আলোড়ন উপস্থিত করে, যদি তা অনেক ক্ষেত্রে বিপজ্জনক বলে চিৎকাব শুরু হয়, তা হলেও গৌণভাবে প্রমাণ হতে পাবে যে সত্যই যুগ প্রবর্তক দেখা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে তাই হয়েছিল। এমন কি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবেও তা ঘটেছিল। নতুন ভাব-ধারাব বাহক হয়ে যে সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটবে তাতে তার পাঠক হয় ঘৃণায় উন্মাদ হবে আর না হয় আনন্দে উন্মাদ হবে। প্রতিভা এই উপায়েই নিজের আবির্ভাব ঘোষণা কবে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে-কোনো নব দৃষ্টিভঙ্গির আবির্ভাবেই পাঠক উন্মাদ হচ্ছে তা হলে তার কারণ খুঁজতে হবে অন্যত্র। তখন বুঝতে হবে বিচার-সাহিত্য স্থষ্টিব অন্তরায় বিশেষণের অভাব নয়, সুস্থ মস্তিষ্কেব অভাব। (১৯৪৭)

অসম্পূর্ণ প্রকাশ

বন্ধু বন্ধুকে লিখলেন—

'যা অনুভব কবি. কিছুই বলা যায় না। তা ছাড়া ভাষার limitation মানুষ কতকাল পরে পার হবে তার তো কোনোই ঠিকানা দেখি না। বলা হচ্ছে ঝুড়ি ঝুড়ি, কিন্তু ঠিক একটি কথায় যা বলা যেতে পাবত তা বলা যায় না।'

অন্তরকে প্রকাশ করাব কি আকুলতা!—অথচ ভাষা নেই।

মানুষ যা কিছু অনুভব কবে, তা সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে ভাষা যে পবিমাণে সমৃদ্ধ হওয়া উচিত ছিল, পৃথিবীব কোনো মানুষেব কোনো ভাষাই সেই পবিমাণে সমৃদ্ধ নয়। সন্দেহ হয় মানুষ ইচ্ছে ক'বে ভাষাকে ততখানি সমৃদ্ধ কবাব চেষ্টা কবেনি। করলে সে ভাষা আয়ত্ত করা কাবো পক্ষে সম্ভব হত না।

মানুষেব অনুভূতি অত্যন্ত জটিল। তাকে যদি বয়নশিল্পেব সঙ্গে তুলনা কবা যায়, তা হলে দেখা যাবে তা সহস্রবর্ণেব মসৃণ তন্তুব একখানি জাল। এই তন্তুগুলি বয়নকালে বর্ণে বর্ণে এমন মিলে গেছে যে, তা থেকে কোনো বর্ণকে পৃথক ক'বে দেখবাব উপায় নেই।

কি দরকার এই জটিলতা সৃষ্টিব? তাব চেয়ে মোটামুটি বোঝা যায় এই বকম ভাষাই মানুষেব কাজে লাগে। মানুষকে এব সাহায্যে হাসানো যায়. কাঁদানো যায়, এই ভাষার সাহায্যেই তাকে উস্কে দিয়ে আব একজনেব সর্বনাশ কবানো যায়, তাকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত কবা যায়, এই ভাষাব সাহায্যে একটা জাতিকে ঘুম পাড়ানো যায়, জাগানো যায়। এই ভাষার সাহায্যেই পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে, আবার এর সাহায্যেই পৃথিবীব শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। যেখানে মানুষ কিছু প্রকাশ কবতে চায় অথচ ভাষা খুঁজে পায় না. সেখানে সে বিনা লজ্জায় পবাজয় স্বীকাব ক'রে বলে "আমি যে কি আনন্দ পেলাম তা প্রকাশ করতে পারছি না।"

কিন্তু যদি মানুষ সত্যিই তার সব কথা প্রকাশেব ভাষা পেত! এই যে মাত্র ছ বছবের মধ্যে এত বড় একটি যুদ্ধ হল, দুপক্ষের মনের কথা প্রকাশ হলে তা থামত না। চেম্বারলেন হিটলারকে কি বোঝালেন, হিটলাব চেম্বাবলেনকে কি বোঝালেন এবং চেম্বারলেন ফিরে গিয়ে বৃটিশ জাতিকে কি বোঝালেন, আমরা তা অনুমান করতে পারছি। অর্থাৎ কোনো পক্ষই অপর পক্ষকে নিজেব কথা বোঝাতে পারে নি। বোঝাতে পাবলে হয় যুদ্ধ বাধত না, নয় যুদ্ধ থামত না। কথা গোপন

করাই সম্ভব হত না। যে যার সামরিক উদ্দেশ্য এবং গোপন খবর নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রকাশ করে ফেলত। কিংবা তার চেয়েও ভয়ানক কিছু হত। অর্থাৎ যুদ্ধ দূরের কথা, পৃথিবীতে মানুষের সমাজ যে ভাবে চলছে সে ভাবে চলত না। তার রূপ সম্পূর্ণ বদলে যেত। মানুষে মানুষে সম্বন্ধ অন্য রকম হত।

এক রসিক মার্কিন লেখক একদা মানুষের ভাষার দৈন্যের কথা ভেবে নতুন ব্যাকরণ লিখেছিলেন। তিনি বলেন, এই যে আমরা প্রতিদিন শত রকম বিভিন্ন অবস্থা বোঝাতে একই বিশেষণ ব্যবহার করি, তাতে তো সত্য জিনিষটি বোঝানো যায় না। যেমন—'কেমন আছ?' প্রশ্নের উত্তরে সর্বদা বলতে হয় 'ভাল আছি' বা 'এক রকম আছি' বা 'ভাল নেই'। —এতে প্রকৃত অবস্থার কতটুকু বোঝানো যায়? ভাল যদি থাকি তবে কি রোজই এক রকম ভাল থাকি? ভাল না থাকারও বহু বিভিন্ন পর্যায় আছে। অথচ কার্যক্ষেত্রে ঐ ধরনের কথাই বলতে হয়। নতুন ভাষা সৃষ্টি করাও তো সম্ভবপর নয়। তাই তিনি বলেন,—ভাল, মন্দ, এই বিশেষণের সঙ্গে ১, ২, ৩, ৪, ৫ প্রভৃতি সংখ্যা ব্যবহার করলে কেমন হয়? "কেমন আছ?" এর উত্তরে ১ ভাল আছি, ২ ভাল আছি বা ৩ ভাল আছি—এই রকম।

এই সংখ্যা তিনি সর্বত্র ব্যবহার করতে বলেন। একটি রচনার সাহায্যে তিনি বুঝিয়েও দিয়েছেন কি ভাবে ব্যবহার করতে হবে। রচনাটির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করি। অনুবাদে রস বজায় থাকবে না, এর বরঞ্চ অনুকরণ চলতে পারে:

As a 19 young and 16 beautiful lady was 52 gaily tripping down the side-walk of our 84 frequented street, she accidentally came in contact—100 (this shows that she came in close contact) —with a 73 fat, but 87 good humoured looking gentleman, who was 93 (i. e. intently gazing) into the window of a toy-shop. Gracefully 56 extricating herself, she received the excuses of the 93 embarrassed Falstaff with a 68 bland smile and continued on her way.

এর পর এক ময়লা পোষাক পরা যুবক ছুটে এসে উক্ত মহিলার হাত স্পর্শ ক'রে বলল,—"এই ব্রেসলেটটি আপনার হাত থেকে পড়ে গেছে—which I have the 71 good fortune to observe, and now have the 94 happiness to hand to you.

Blushing with 76 modesty the lovely (76, as before of course)

lady took the bracelet. মহিলা ধন্যবাদ দিয়ে সেটি ব্যাগে পুরলেন। The young man noticed the action and 73 proudly drawing back, added—

"Do not thank me. The pleasure of gazing for an instant at those 100 eyes has already more than compensated me for any trouble that I might have had."

She thanked him, however, and with a 76 deep blush and 48 pensive air, turned from him and pursued with 33 slow step her promenade. (John Phoenix).

কিন্তু এত সূক্ষ্ম হিসাবের দরকার কি ?

রবীন্দ্রনাথ মাঝখানের কথার চেয়ে শেষ কথাব উপর জোর দিয়েছেন বেশি।

গেয়েছেন—"যাবার বেলা শেষ কথাটি যাও বলে", কিন্তু শেষ কথাটিও যে বলা যায় না তা তিনি জানতেন, সেইজন্য ঐ মিনতি গান হয়ে ফুটে উটেছে। ঐ সুর আসন্ন বিচ্ছেদ বিধুরের কণ্ঠে চিরদিন ধ্বনিত হবে, ঐ মিনতি চিরদিনের মিনতি।

শেষ কথা মানুষের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। লাবণ্য কি অমিতকে তাব শেষ কথা বলতে পেরেছে তার শেষের কবিতায় ? তাব প্রতিদিনের কাজেব অবসবে কি অমিতের কথা ভেবে তার বুকের ভিতব হাহাকাব ক'বে ওঠেনি ? তার কি মনে হয়নি, কত কথা সে বলতে পারত অথচ বলা হল না শুধু অমিতকে সে ভালবাসে বলে ? অমিতকে সে কল্প-জগতের বাইরে বাস্তব জগতের সীমায় টেনে রাখবার অসহ দুঃখ দিতে চায় না বলে ?

মনের কথা সীমাবদ্ধ ভাষাতেও যতখানি প্রকাশ করা যায়, মন অনেক সময় ততখানি প্রকাশে তৃপ্তি পায় না বলে এক এক সময় কল্পনা করে, হায় রে ! এমন কেন একটি মাত্র শব্দ নেই, যা ধ্বনিত হওয়া মাত্র অসমাপ্ত প্রকাশের সমস্ত অস্বস্তি দূর হয়ে যাবে ?

এ জগতে নিজেকে সম্পূর্ণ প্রকাশ কি কেউ করে নি ? আমার মনে হয়—নিষ্প্রাণ জগৎকে আমরা যেভাবে দেখি, তাতে তার সব কথাই বলা শেষ হয়ে গেছে। এক খণ্ড পাথর, সে সম্পূর্ণরূপে একখণ্ড পাথর ছাড়া আর কিছুই নয়। তার দ্যোতনা নেই, কোনো ইঙ্গিত নেই, তার কোনো গোপনীয়তা নেই, সো কেবলই পাথর। কারণ তার মধ্যে চেতনা নেই, প্রাণ নেই। প্রাণই আত্মপ্রকাশে ব্যাকুল। কিন্তু প্রাণের চেয়েও বেশি ব্যাকুল মন। মনকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করা যায় না, তাই মন এত সুন্দর।

সে নিজের কথাটি বলবার জন্য ভাষা খুঁজে মবে, সেই খোঁজার মধ্যেই তার সৌন্দর্য। সে যে বলতে পারে না অথচ বলতে চায়, সেইখানেই সে সুন্দর। কিন্তু সত্যই কি সে পারে না? ঐ ব্যাকুলতার মধ্যেই কি তার কথা ধ্বনিত হয়ে ওঠে না?

যে কথা আভাসে ইঙ্গিতে এবং অনেক সময় সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয়েই অধিকতর সার্থকতা লাভ করে, তার ধ্বনিরূপ নেই, কিন্তু তবু তা বাধা সৃষ্টি করে না। ও কেবল বোঝার ভুল, কারণ অন্তরকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করার ভাষা থাকলে সেই ভাষাই প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করত। হৃদয়কে হৃদয় দিয়ে অনুভব করা অসম্ভব হত। এবং প্রেম করতে হত যাত্রার দলের অ্যাকটিং-এর সাহায্যে।

অন্তরের ভাষা অন্তর একটুখানি ইঙ্গিতের সাহায্যেই বুঝতে পারে, তার জন্য সে শ্রুতির উপর পুরোপুরি নির্ভর করতে চায় না। তাইতে মনে হয়, মানুষ বুদ্ধি দিয়ে যে ভাষা অনায়াসে সৃষ্টি করতে পারত, সে ভাষা সৃষ্টি করতে তার মন রাজি হয়নি বলেই ভাষা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। সে ভাষাকে সীমাবদ্ধ ক'রে ভাষাব উদ্দেশ্যকে বেশি সফল করেছে। তা না হলে সংসারে গীতিকাব্যের এবং সঙ্গীতের জন্ম হত না, রোমান্স অন্তর্হিত হত—এমনকি ছোট গল্পের জন্ম হত কিনা সন্দেহ। এবং সেই সঙ্গে ব্যবসায়ী সেই ভদ্রলোকের দুর্দশা কি হত সে কথাও স্মরণ করা উচিত। তিনি তো তাঁর বক্তব্য সফল করার জন্যই লিখেছিলেন—

Sir, my typist being a lady, cannot put down what I think of you. I, being a gentleman, cannot think of it. But you being neither, will understand what I mean

(১৯৪৫)

মিথ্যাচারের বিদ্যা

প্রথমেই বলে রাখি, এই বিদ্যা আমি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিনি। মিথ্যাচারকে বা মিথ্যা ভাষণকে বিদ্যা হিসাবে চর্চা করেছেন এমন অনেক গুণীই সংসারে আছেন যাঁরা নিঃসন্দেহরূপে আমাকে অতিক্রম ক'রে গেছেন। তাঁরা সবাই আমার শ্রদ্ধেয়।

মিথ্যাকে বিদ্যা হিসাবে চর্চা করা হয় এইজন্য যে আমরা সবাই অল্পবিস্তর মিথ্যার জগতে বাস ক'রে বেশি আরাম বোধ করি। কারণ এইটেই আমাদের নিজের গড়া জগৎ, আর নিজের গড়া জগতের প্রতিই যে আমাদের মমত্ব বেশি সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। তা ছাড়া একটা কথা অন্তত সকলেরই জানা আছে যে এই বিশ্ব-সংসারে সত্য কি তা আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ আবিষ্কার করতে পারেনি। সত্যের সন্ধানে পৃথিবীর দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকগণ নিযুক্ত আছেন, তাঁরা যুগ যুগান্তর ধরে ছুটে চলেছেন সত্য-মরীচিকার উদ্দেশে—আর সেই সুযোগে আমরা মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করবার অবাধ স্বাধীনতা ভোগ ক'রে আসছি যুগের পর যুগ।

কিন্তু একটি কথা।

সত্য কি তা যদি আমরা নাই জানি, তা হলে সত্য এবং মিথ্যা কথা দুটি চলছে কি ক'রে?

আমরা যা কিছু করি বা বলি তা সত্য কি মিথ্যা জানি না এ কথা সত্য, কিন্তু তবু সত্য এবং মিথ্যার মোটামুটি একটা ধারণা আমাদের অবশ্যই আছে। কারণ দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক যে সত্যানুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন সে হচ্ছে শেষ সত্য বা ধ্রুব সত্য। এই শেষ সত্য কি তা আমরা জানি না, কিন্তু কাজচলা গোছের সত্য আমরা জানি এবং বুঝি। নইলে আমি যে এতগুলো সত্য কথা বলছি তা বুঝছি কি ক'রে? কিন্তু মজা এই যে, কাজচলা গোছের সত্য সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা এত অস্পষ্ট যে তার ফলে অনেক মিথ্যাকে সত্য বলে এবং অনেক সত্যকে মিথ্যা বলে মানতে আমাদের কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না। এবং তাতে শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়ায় যে, সত্য সেটাই যা আমার কাছে সত্য, এবং সেটাই মিথ্যা যা আমার কাছে মিথ্যা।

এরই ফলে আমাদের ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে কিছু অশান্তি ঘটে। এবং এরই ফলে, যে-লোকটি কল্পনাপ্রিয় এবং বিনা দ্বিধায়, নির্ভয়ে, অম্লানবদনে, যে-কোনো দেখা বা

জানা বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে গল্প বানিয়ে যাচ্ছে তাকে বলছি মিথ্যাবাদী, আর যে-লোকটি কোনো শোনা ঘটনাও নীরস ভাবে সত্যের উলঙ্গ চেহারায় ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করছে তাকে আমরা খাতির করছি। যাকে আমরা সত্যের চেহারা বলছি তা আর কিছুই নয় প্রাণহীন কতকগুলো সংজ্ঞা, তত্ত্ব, বা তথ্য। কখনও বা তা সংখ্যাতত্ত্ব কখনও বা তা স্থানীয় তথ্য।

সাধারণত আমাদের ধারণা এই যে যা প্রকৃতি থেকে আমাদের বোধনিরপেক্ষ ভাবে ঘটে তাই একমাত্র সত্য, এবং ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ যন্ত্রের দৃষ্টিতে দেখাই একমাত্র দেখা। কিন্তু এই নিরপেক্ষ যান্ত্রিক দৃষ্টি মানুষ সব সময় পাবে কোথায়? তাই ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে একই ঘটনা বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রকমে দেখে. একই ঘটনাকে আমরা সবাই এক রকম দেখতে পারি না। কারণ একটি ঘটনা ঘটে স্থান ও কালের মধ্যে। সেই স্থান ও কালের একটি অখণ্ডতা আছে, এবং তার বিভিন্ন মাত্রা আছে। কারো দৃষ্টিই সেজন্য কোনো ঘটনাকে একই সঙ্গে সমগ্রভাবে দেখতে পারে না, কারণ তা করতে গেলে একই সঙ্গে সকল দিক থেকে দেখা চাই। কিন্তু আমরা যখন সামনে দেখছি তখন পিছনটা দেখি না, উপর এবং নিচে দেখি না, দুই পাশেও দেখি না। তা ছাড়া এই সমস্ত দিককে ঘটনাকালের সঙ্গে এক করেও দেখি না। সুতরাং আমরা যখন কোনো ঘটনা স্বচক্ষে দেখছি বলে গর্ব করি, তখন আসলে তার ছোট একটি অংশ মাত্র দেখি, এবং সেটুকু দেখাতেও বহু রকম ত্রুটি থাকে। এ একেবারে বৈজ্ঞানিক সত্য—যন্ত্র দিয়ে মেপে দেখা সত্য। কথাটা ভাল লাগছে না জানি কারণ নিছক সত্য কথা ভাল লাগে না। আমার বক্তব্যও তাই।

আমি বলতে চাই যে আমি যখনই কোনো বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে কোনো বিবৃতি দিই, তখন অনেক সময়েই আমার আংশিক জানা বা দেখা বিষয়ের সঙ্গে আমার কল্পনা মিশিয়ে সেই আংশিক জিনিসকে পূর্ণাঙ্গ ক'রে তোলার চেষ্টা করি। একই ঘটনা দুজনে দুরকম দেখেছি বা জেনেছি, সুতরাং দুজনের বর্ণনাও তফাৎ হবেই। এ রকম ক্ষেত্রে যার কল্পনাশক্তি বেশি, এবং এই কল্পনাশক্তির সহোযো যে সেই দেখা ঘটনাকে যত বেশি সর্বাঙ্গসুন্দর ক'রে পুনর্গঠন করতে পারে, সে তত বড় শিল্পী।

তার মানে, যে বিশ্বজগতে আমরা বাস করি শুদ্ধমাত্র সেই জগৎটুকুর আংশিক জ্ঞান নিয়ে আমরা বাঁচতে পারি না। সামান্যমাত্র দেখা বা জানা উপকরণ নিয়ে আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কল্পনাশক্তি বলে আর একটি ক'রে জগৎ সৃষ্টি ক'রে চলেছি আংশিক-প্রত্যক্ষ জগতের সমান্তরালভাবে। অথবা এই জগৎকেই কেন্দ্র

ক'রে একেও নূতন করে গড়ে তুলছি। এই জগৎ যার হাতে যত বেশি সুন্দর, যার কল্পনায় যত বেশি পূর্ণাঙ্গ সে তত বড় শিল্পী। এতে আর একটি বড় কথা প্রমাণ হয় এই যে পূর্ণাঙ্গ সত্যের চেহারা আমাদের কল্পনা-বহির্ভূত নয়।

কিন্তু কল্পনার জগৎ এক হিসেবে মিথ্যে জগৎ।

আর সেই কারণে যে কথাশিল্পী টুকরো বিচ্ছিন্ন ঘটনার অভিজ্ঞতা থেকে আপন কল্পনা-বলে একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস রচনা করেন সেই রচনাও মিথ্যা। অথচ সেই মিথ্যা, শিল্পীর কল্পনা-নৈপুণ্যে আমাদের কাছে কত বেশি সত্য হয়ে ওঠে। চিত্র-শিল্পী যে ছবি আঁকেন সে সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। প্রকৃতির দিকে চেয়ে তিনি যা দেখছেন তা যে সম্পূর্ণ দেখা নয়, তার প্রমাণ তাঁর ছবিতেই মেলে কেননা সেই ছবিতে অনেকখানিই থাকে তাঁর কল্পনার রং। যিনি আংশিক দেখা উপকরণ নিয়ে তার সঙ্গে কল্পনা যোগে কিছু গড়ে তুলতে পারেন না, উপকরণ সংগ্রহেই যাঁর সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত, তিনি শিল্পী নন।

আংশিক দেখা জিনিসের উপকরণে, 'মিথ্যা' যোগে, আংশিক সত্যকে পূর্ণাঙ্গ ক'রে তোলাই শিল্পীর কাজ। এই আংশিক দেখার ক্রটিকে এই ভাবে তিনি সংশোধন ক'রে নেন। তার মানে, মনের মতো ক'রে পুনর্গঠনই হচ্ছে শিল্পীর কাজ। তার মানে, শিল্পীর চোখে প্রকৃতি সম্পূর্ণ সুন্দর নয়, সম্পূর্ণ সুন্দর হয় তখন যখন তিনি তার অপূর্ণতাকে পূর্ণ ক'রে তোলেন। কিন্তু কল্পনা যে শুধু আংশিক সত্যকে সমগ্রতা দান করে তাই নয়, কল্পনা আংশিক সত্যকে মনের মতো ক'রে পরিবর্তন করে, আর সত্য এইভাবে পরিবর্তিত হয়ে সুন্দরতর হয়ে ওঠে। দেখতে হবে এই পরিপূরণের কাজ, এই পরিবর্তনের কাজ, আমাদের মনে আনন্দ জাগায় কিনা। আমরা ভুল-ক'রে যাকে সত্য বলি তা আমাদের জীবনে কত মিথ্যা, এবং ভুল ক'রে যাকে মিথ্যা বলি, তা আমাদের কাছে কত সত্য তা যে কোনো উৎকৃষ্ট কাব্য পাঠ করলেই বোঝা যায়। যদি কবি সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলব না প্রতিজ্ঞা ক'রে তাঁর প্রিয়তমকে বলতেন তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ে পাঁচ ঘণ্টা বা দশ ঘণ্টা রাখলাম তবু হৃদয় জুড়োলো না, তা হ'লে কবির সেই বেদনা আমাদের কাছে সত্য হয়ে উঠত না। কিন্তু লাখ লাখ যুগ নামক মিথ্যাটাই লোকের মনকে চিরদিনের জন্য অধিকার ক'রে রইল। কবি লিখলেন "শূন্য মন্দির মোর"—কিন্তু তিনি যে মিথ্যা বললেন, তা যে-কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করতে পারেন। বলতে পারেন, মন্দিরে অন্তত অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের প্রাধান্য ছিল, ভরাবাদর হেতু বাষ্পও ছিল প্রচুর, সুতরাং শূন্য মন্দির কথাটা মিথ্যা। যদি বল মন্দিরটা বাঁইরের

নয় অন্তরের, তা হলে শূন্য ছিল না প্রমাণ করা আরও সহজ হবে। কিন্তু আমরা সে প্রমাণ চাই না।

এইভাবে আমরা জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই মিথ্যাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। এই মিথ্যাই আমাদের জীবনে বেশি সত্য হয়ে উঠছে, নইলে জীবন থেকে আনন্দ দূর হয়ে যেত, জীবন মরুভূমিতে পরিণত হত। কিন্তু একে মিথ্যা বলা কি ঠিক হচ্ছে?

আসলে এটা মিথ্যাই নয়। এ হচ্ছে সত্যের পরিপূরক। সত্যকে জানি আমরা একটুখানি, তারই সঙ্গে কল্পনা যোগ ক'রে বাকী অংশটুকু পূরণ করি। সাধারণ একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। আমরা কাউকে যখন কোনো একটা কাজ করতে দুতিন বার বলা সত্ত্বেও সে কাজটা করল না দেখি, তখন চটে গিয়ে বলি—"পঞ্চাশ বার কাজটা করতে বললাম, তবু শুনলে না?"

কিন্তু পঞ্চাশ বার বলেছি—এ রকম বলি কেন? এটা তো স্পষ্টই মিথ্যা কথা। অথচ তা জেনেও আমরা ঐ রকম বলি, এবং যাকে বলি সেও তার কোনো প্রতিবাদ না ক'রে কথাটা মেনে নেয়। বলে না যে পঞ্চাশ বার বলনি, বলেছ দুবার কিংবা তিনবার। এ রকম হয় কেন?

তার কারণ যখন বলি পঞ্চাশ বার বলেছি, তখন আমি এই বোঝাতে চাই যে পঞ্চাশ বার বললে কথাটায় যতখানি গুরুত্ব ফুটে উঠত, তিন বার বলাতেই তাতে আমি ততখানি গুরুত্ব যোগ করেছি। পঞ্চাশ বার বলার গুরুত্ব তিন বার বলাতেই যে ফুটে উঠেছে এ কথা আমিও বিশ্বাস করি, এবং যাকে বলেছি সেও বিশ্বাস করে। সেইজন্য আমিও বলি এবং সেও প্রতিবাদ করে না। অন্য কথায়, দু বার বলা আংশিক সত্য, কাল্পনিক পঞ্চাশ বার বলা পূর্ণ সত্য।

বলেছি, কল্পনা শুধু আংশিক সত্যকে পূর্ণাঙ্গ করে তাই নয়, আংশিক সত্যকে অনেক সময় মনের মতো ক'রে পরিবর্তন করে। এতে স্পষ্টই বোঝা যায় প্রকৃতিতে যা ঘটে তাই আমাদের কাছে সত্য নয়; কারণ তার অংশ মাত্র আমাদের চোখে ধরা পড়ে বলে সে হয়ে দাঁড়ায় সত্যের বিকার। আমরা তখন তাকে রূপান্তরিত ক'রে পূর্ণাঙ্গ সত্যে পরিণত করি। সেইখানে আমরা হই শিল্পী। আর এই পূর্ণাঙ্গ সত্যই হচ্ছে জীবন। সত্য পূর্ণাঙ্গ হলেই তা জীবন্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু শিল্পীর কল্পনাকে ঐ আংশিক সত্যই উদ্বুদ্ধ করে। আংশিক দেখা সত্য সত্যের বিকার হলেও তাতে থাকে পূর্ণ সত্যের শত রকম ইঙ্গিত। বিভিন্ন শিল্পীর মনে বিচিত্র রূপে এই ইঙ্গিত ধরা পড়ে। যার কাছে বেশি ধরা পড়ে এবং সেই

ইঙ্গিতের অর্থ বেশি স্পষ্ট হয় তার হাতের পুনর্গঠন হয় বেশি সার্থক।

ধরা যাক পোস্টমাস্টার গল্পটি। এই গল্পে উলাপুর গ্রামের যে পোস্টমাস্টারটি চিত্রিত হয়েছে তার অস্তিত্ব হয় তো কোনো একটা বিশেষ গ্রামে ছিল। এ রকম গ্রাম্য পোস্টমাস্টারের অস্তিত্ব শত শত আছে। তারা সংসারের আর সবার মতোই বিশেষত্বহীন আংশিক সত্য। অর্থাৎ তারা পোস্ট অফিসের হিসাবের খাতায় সত্য, কিন্তু আমাদের কাছে মিথ্যা। রবীন্দ্রনাথ এই রকম একটি বিশেষত্বহীন মিথ্যা আমাদের কাছে সত্য ক'রে তুলেছেন। আমরা যখন এই গল্পটি পড়ি তখনই বুঝি এর প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনা মিলে সমগ্র ছবিটি একটি অখণ্ড সত্যে পরিণত হয়েছে। আর তা এমন পূর্ণাঙ্গ সত্য যে এর থেকে কোনো একটি ক্ষুদ্র অংশও বাদ দেবার উপায় নেই। এই পোস্টমাস্টারের বাস্তব অস্তিত্ব আমাদের কাছে ছিল মূল্যহীন, কিন্তু যেমনটি হ'লে আমাদের মনে সে সত্যরূপে চিরকাল বাস করতে পারে, রবীন্দ্রনাথ সেইভাবে তাকে রূপান্তরিত করেছেন। অর্থাৎ তথাকথিত সত্য শিল্পীর কল্পনাবলে তথাকথিত মিথ্যারূপে ফুটে উঠেই আমাদের কাছে প্রকৃত সত্য হয়ে উঠেছে। এই মিথ্যাই সকল শিল্পের প্রাণ। এই মিথ্যাই হচ্ছে শিল্প।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে কি এই মিথ্যাই আর্টের আদর্শ? এর উত্তরে ঘুরিয়ে বলা যায় অক্ষম শিল্পীর মনগড়া মিথ্যা আর্ট নয়, সে হচ্ছে ধাপ্পা, ইংরেজীতে misrepresentation। একটার নাম ক'রে আর একটা চালানোর চেষ্টা। আধুনিক সাহিত্যে এর অভাব নেই। কাহিনীর নামে কতকগুলো হাসপাতালের রোগীর তথ্য অথবা যে কোনো সংখ্যাতত্ত্ব থেকে অন্য কোনো তথ্য। তাকে মিথ্যা বলবার উপায় নেই, গভর্নমেন্টের বই খুলে তার সত্যতা প্রমাণ করা যাবে, কিন্তু সমস্ত মিলে তা কোনো কাহিনী বা শিল্প হয়ে ওঠেনি। অর্থাৎ তার মধ্যে কল্পনার স্থান সঙ্কীর্ণ বলে তা আমাদের কাছে পূর্ণ সত্য বা জীবন্ত হয়ে ওঠেনি। কাহিনীর নামে তথ্য সংগ্রহ কিংবা তথ্য সংগ্রহের নামে কাহিনী রচনা এ দুটোই হচ্ছে ধাপ্পা—misrepresentation। অস্কার ওয়াইল্ড বলেন মিথ্যাকে শিল্প বিজ্ঞান এবং সামাজিক উপভোগ্য হিসাবে চর্চা করা হচ্ছে না বলেই আমাদের এত অবনতি। এই সত্য কথাটির জন্য তাঁকে প্রণতি জানাই।

আসল মিথ্যা হচ্ছে ধাপ্পা। এই ধাপ্পার সঙ্গে শিল্পীর কল্পনাকে যেন একাসনে না বসাই। যিনি রঙ্গমঞ্চে রাম সেজে সীতার বনবাসজনিত দুঃখে নিজে কাঁদছেন এবং দর্শককে কাঁদাচ্ছেন তিনি কোনো কালে রাম নন, হয়তো তিনি

কোনো অফিসের কেরানি। কিন্তু আমাদের কাছে তখন সেই বামই সত্য, তাঁব দুঃখও সত্য। কিন্তু উক্ত কেবানি যদি তাঁর অফিসে নিজেকে রাজা বামচন্দ্র ব'লে প্রচার করতে যান তা হলে সেইটে হবে ধাপ্পা। সত্য ও মিথ্যাব পার্থক্য এইখানে।

কিন্তু মিথ্যা ভাষণেব বা আচারেব প্রথম অভ্যাসকালে অনভিজ্ঞতাবশত শিল্পীব প্রাথমিক প্রচেষ্টাকে ধাপ্পা বলে মনে হতে পারে, তবু যারা ছেলে বয়সু থেকে এই বিদ্যা চর্চা করতে যাচ্ছে তাদের নিরুৎসাহ করা উচিত নয়, কেননা ভবিষ্যতে বড শিল্পী হবার সম্ভাবনা তাদেরই।

(১৯৪৭)

'মহাবিদ্যা'র জগৎগুরুর উদ্দেশে

জগৎগুরু,

তোমার কাছ থেকে মহাবিদ্যার পাঠ নেবার জন্য তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু কেউ কি তোমার ঠিকানা জানে? তুমি যে-অমৃতের অধিকারী তার একটুখানি না পেলে যে আর চলে না। সবাইকে প্রশ্ন করি, তুমি কোথায়? যে অমৃত লুকানো তোমায়—সে কোথায়?

শুনতে পাই তুমি অত্যন্ত কাছে এসে গিয়েছ। শুনতে পাই ওরা দীক্ষা নিয়ে নিয়েছে। সেই ওরা—সেই হোমরাও সিং, চোমরাও আলি, লুটবিহারীর দল।

কিন্তু শুধুই কি শুনতে পাই? বুঝি না কি? মর্মে মর্মে কি উপলব্ধি করি না প্রতিদিন?

করি, জগৎগুরু।

চায়ে যখন মিষ্টির টান পড়ে; খেতে বসে যখন দাঁতে পাথর ভাঙি, যখন কাপড় কিনতে গিয়ে জাল এবং ওষুধ কিনতে গিয়ে জল কিনে আনি, এক সের ওজনে যখন তেরো ছটাক পাই, তখনই তো বুঝতে পারি এ তোমারই মায়া। যখন ট্রামে বাস্-এ ঘুরে ঘরে ফিরি, তোমারই অদৃশ্য হাত অনুভব করি পকেটে পকেটে। (মাসে তিনবার পকেট করাতে হয় দর্জিকে দিয়ে।)

এতদিন অভিমান ছিল, তাই তোমাকে চাইনি। আজ অভিমান ভেঙেছে।

গত মহাযুদ্ধের সময় তুমি ওদের মহাবিদ্যায় দীক্ষা দিয়েছ। হয়তো সে সময় চেষ্টা করলে হত, কিন্তু আশা করেছিলাম তুমি নিজে থেকে ডেকে নেবে। এই মিথ্যা দম্ভে শুভ সুযোগ হারিয়েছি। চোখের উপর দেখেছি সব, অথচ এগিয়ে যাইনি। যখন মহামন্বন্তর সৃষ্টি করলে বাংলা দেশে, তখন তো আমি তোমার কাছেই ছিলাম। যখন 'বঞ্চনা নীতি'র বঞ্চিতদের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা বের করে নিলে তখনও আমি তার সাক্ষী ছিলাম। যখন ভারতে-অচল ক্যানাডার রেল ইঞ্জিনে প্রায় আড়াই কোটি টাকা উড়িয়ে দিলে তখন তুমি অদৃশ্য। যখন কাছে ছিলে তখন অভিমান মাথা তুলে দাঁড়াল, আজ তুমি কাছে নেই, আজ আমার অভিমান ভেঙেছে। আজ স্বাধীন ভারতে তোমার সান্নিধ্য অনুভব করি, তোমার স্পর্শ পাই, তোমার লীলা প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু তোমাকে খুঁজে পাই না।

তোমাকে কত রূপে দেখেছি, অথচ তোমার মুকুটমৌলি বিশেষ কালো রূপটি দেখি না ; সেটি কি কালোবাজারের সঙ্গে নির্বিশেষভাবে মিলিয়ে আছে ?

স্বাধীন ভাবতে তোমার লীলার অন্ত নেই। সুইডেনের প্রি-ফ্যাব বাড়ি আমদানি ক'রে তুমি তেরো লক্ষ টাকা উড়িয়ে দিলে। তারপর সুইডিশ শিল্পীর তত্ত্বাবধানে তৈরি-বাড়ির কারখানা খুলে প্রায় এক কোটি টাকা ধোঁয়া বানিয়ে দিলে। ফার্টিলাইজারের এক কোটি টাকার কলঙ্ক-বিষ হজম করলে। জীপ গাড়ি ও অস্ত্র-শস্ত্র কেনার ব্যাপারে নামগোত্রহীন ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানের মারফৎ প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা বের ক'রে নিলে। আসাম-ত্রিপুরা রাস্তা তৈরিতে কুড়ি লক্ষ টাকা শূন্যে মিলিয়ে দিলে। হীরাকুদ বাঁধের কাজে তোমারই অদৃশ্য হাত খেলা করেছে। কেপমারির কৌশলে, ব্যাঙ্কমারের হাত-সাফাইয়ে তোমারই লীলা প্রকট। কাপড়ের কলে, চিনির কলে, তোমারই খেলা।

অভিমান ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। মন দীক্ষায় আকুল।

দেখা পেয়েছিলাম সেদিন লুটবিহারীর। কি ঐশ্বর্য! তাঁর নতুন নাম লুটো মহারাজ। লুটের ব্যাপারে তিনিই নাকি বড় ওস্তাদ।

অনুশিষ্যেরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তাদের ঠেলে এগিয়ে গিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরেছিলাম।

লুটো মহারাজ আমার দুঃসাহসে কটমট ক'রে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। অনুশিষ্যেরা আমার প্রতি হিংস্র হয়ে উঠল। আমি ক্ষীণকণ্ঠে তাঁকে বললাম—জগৎগুরুর ঠিকানাটা দয়া করে দিন!

লুটো মহারাজ গর্জে উঠে বললেন - জানি না।

তাঁর রোল্‌স্ রয়েস চলতে আরম্ভ করল। অনুশিষ্যেরা আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল।

ধূলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছি, এমন সময় দেখি গাড়ি ধীরে ধীরে পিছিয়ে এলো আমার দিকে। লুটো মহারাজের দৃষ্টি এবারে করুণাকোমল। বললেন—তোমার কাছে গোপন করেছিলাম, জগৎগুরুর ঠিকানা আমি জানি।

তাড়াতাড়ি পকেট থেকে নোট বুক বের ক'রে বললাম—কি ঠিকানা বলুন।

লুটো মহারাজ বললেন ঠিকানা জানি, কিন্তু বলব না। কারণ, বলা যায় না। আর, বললেও তাঁকে খুঁজে পাবে না। ক্ষেত্র প্রস্তুত হলে তিনি আপনা থেকেই দেখা দেবেন। তিনি নিকটেই আছেন। কিন্তু বোধ হয় তাঁর আত্মপ্রকাশের সময় হয়ে এসেছে। আমার রিপোর্টের উপর নির্ভর করছে সব।

আমি তাঁরই আদেশে ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াচ্ছি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে কি না। যখন বুঝব প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসতে আর তাঁর লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই, তাঁর লোভনীয় প্রভাব দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে, সবাই তাঁকে চায়, তখন তিনি প্রকট হবেন। বুঝতে পারছি সময় এসে গেছে।

লুটো মহারাজ আমাকে আশ্বস্ত ক'রে বিদায় নিলেন।

আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করেছি।

দিন গুনছি।

(রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা কথাসাহিত্য প্রকাশিত—১৯৫৩)

ধূম্রদর্শন

(ধোঁয়া দেখা নয়)

সেদিন ইংরেজি একটি গল্পে পড়ছিলাম, একজন লোক তার বন্ধুকে একটি ভাল সিগার দিতে গেলে বন্ধু বলল, "আমি ধূমপান ছেড়ে দিয়েছি।" লোকটা বলল, "তাই না কি ?— তাহলে এটা কালকের জন্য রেখে দাও।"

গল্পটি পড়ে আমি নিজের ধূমপানের কথা ভাবতে লাগলাম। আমিও অনেকবার ধূমপান ছেড়ে দিয়েছি এবং এখনও মাঝে মাঝে স্থায়ীভাবে ছেড়ে দিই। সামান্য ধূমপান ব্যাপার নিয়ে এইভাবে কতদিন নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গিয়েছি, কিন্তু কোনো মীমাংসা হয়নি। ফলে আমি নিজেকেই ভাল ক'রে চিনতে পেরেছি। অর্থাৎ আমি বুঝতে পেরেছি আমার মন বৈজ্ঞানিক মন, কোনো কিছুকে ধ্রুব বলে জীবনে মেনে নিতে পারে না। কখনও বিশ্বাস করেছি ধূমপান আমার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, কখনও বিশ্বাস করেছি ধূমপান আদৌ প্রয়োজনীয় নয়। এই দ্বন্দ্বে পড়ে আমি নিরাসক্তভাবে সংসারের স্রোতে ভেসে চলেছি।

জীবনে কোনো জিনিসই তো তুচ্ছ নয়। তাই যখনই মনে হয় তামাক খাব কেন, তখনই ভাবি তামাক ছাড়ব কেন ? মানুষের জীবনে এমন মুহূর্ত প্রতিনিয়তই ঘটছে যখন সে বরঞ্চ ভগবানকে ভুলে থাকতে পারে কিন্তু তামাক ভুলে থাকতে পারে না। পরিহার্য এবং অপরিহার্য যখন সময় এবং ক্ষেত্র বিশেষে এক হয়ে যায়— কোন্‌টা ছাড়ব কোন্‌টা রাখব এ বিচার যখন প্রতিদিনই আমাদের জীবনে নতুন ক'রে করতে হয় তখন তামাক-পক্ষীয়েরা তামাকের দাবী ছাড়বেন কেন ?

অনেকে বলেন তামাক না হলেও চলে। কিন্তু কথাটা কি সত্য ? অন্তত এ যুগে সত্য নয়। আমাদের দেশে তামাকের প্রচলন কবে থেকে হয়েছে তার ইতিহাস জানা নেই। খ্রীষ্টোত্তর ৭ম শতকে লেখা সংস্কৃত সাহিত্যে ধূমপানের উল্লেখমাত্র দেখা যায়। কিন্তু ইউরোপে তামাক প্রচলনের ইতিহাসটি আমরা জানি। সেখানে যখন তামাকের নতুন প্রচার হচ্ছিল তখন তামাক তুচ্ছ জিনিসই ছিল - সেই প্রায় চারশ বছর আগে। তখনকার কথা ভাবুন। এক একটা দেশ নবনেশাধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ অনভ্যস্ত আনাড়ি নিকোটিন-ঘূর্ণিত শিরে ধূমপানের সাধনা করছে— একসঙ্গে জাতিগতভাবে ধোঁয়া টানছে এবং জাতিগতভাবে কাসছে আর অস্থির

হচ্ছে। সামান্য জিনিস নিয়ে এ রকম মহাদেশগত সাধনা ইতিহাসে বোধ হয় খুব বেশি নেই। সেদিন তামাক জিনিসটি যে কি তা জানবার আগে বিশ্ববাসীর মনে অজ্ঞাতসারে যে ধূমকামনা প্রধূমিত হচ্ছিল, বর্তমান যুগে তা বিশ্বজুড়ে এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করেছে।

সেই আগুন ইংল্যাণ্ডে প্রথম লেগেছিল সার ওয়লটার রলির মাথায়। গল্প আছে সার ওয়লটার প্রথম ধূমপান করছিলেন, তাঁর ভৃত্য তা দেখে ভাবল প্রভুর মাথার মধ্যে আগুন ধরে গেছে, নইলে মুখ থেকে নাক থেকে অকারণ এত ধোঁয়া বেরোবে কেন! সে দারুণ ভয় পেয়ে চিৎকার ক'রতে করতে ছুটে গিয়ে জল এনে ঢালল প্রভুর মাথায়। সে হয়তো বুঝেছিল ঠিকই, কিন্তু ও আগুন যে জলে নেবে না সেইটে সে জানত না। ভৃত্যের দোষ নেই—ও দেশের শাসনকর্তারাও ও-আগুন নেবানোর কৌশল জানতেন না, তাই তাঁরা তামাকের বিরুদ্ধে নানা রকম কড়া আইন করেছিলেন, কিন্তু তামাক ছিল আইনের চেয়ে কড়া।

তামাকের সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডে সে সময় ভয়ানক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। রাজা প্রথম জেম্‌স্ স্বয়ং ছিলেন তামাক-বিরোধী। ধূমপায়ীদের শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছিল অতি কঠোর। কোনো কোনো দেশে তামাক খাওয়া আর মানুষ খুন করার মধ্যে শাস্তির দিক দিয়ে কোনো পার্থক্য ছিল না। সুইসারল্যাণ্ডের বার্ন প্রদেশে তামাক খাওয়া Ten Commandments-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তামাক খাওয়া নৈতিক অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছিল। কিন্তু মজার কথা এই যে যে-ইংল্যাণ্ডে ধূমপায়ীদের শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছে—সেইখানে এখন তামাকের মাশুল থেকে আয় হয় বছরে প্রায় এক কোটি টাকা। সুতরাং সামান্য তামাককে যদি নেশা-নিরপেক্ষ হয়েও বলা যায় অসামান্য তা হলে অন্যায় কিছু হয় না। অন্যায় না হওয়ার আরও কারণ এই যে চিকিৎসাশাস্ত্র মতে তামাক একটি বিষ—বহুদিন ধরে এবং বহু পরিমাণে তামাক খেলে হৃৎপিণ্ড স্নায়ু এবং পরিপাক যন্ত্রের উপর মারাত্মক ক্রিয়া প্রকাশ পেতে পারে, অথচ তামাক যাঁরা খান তাঁরা কেউই কম খান না আর দুএক দিন খেয়েই মহাপরিতৃপ্ত হয়ে ছেড়ে দেন না। তামাককে যাঁরা বলেছেন বিষ তাঁদেরই দেশের এক কবি ইংল্যাণ্ডে তামাক-প্রচলন এবং তামাক-বিরোধী আন্দোলনের শ'খানেক বছর পরে (১৭শ শতাব্দীতে) বলেছেন, This noble fume does dry up ill nature. অর্থাৎ এই অভিজাত ধোঁয়া মনের বিষ দূর করে। আরও বলেছেন, We on tobacco can keep ourselves sound. অর্থাৎ আমরা তামাকের কৃপায় স্বাস্থ্য বজায় রাখতে পারি।

সুতরাং তামাক একাধারে বিষ এবং বিষনাশক। আমি তামাককে অসামান্য বলেছি নেশা-নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে। তামাক যাঁদের নেশা তাঁদের পক্ষে তামাক অসামান্য তো বটেই। বুদ্ধিজীবীরা যে বিভাগেই কাজ করুন প্রায় সবাই জীবনের গোড়ার দিকে অন্তত একবার কবিতা লেখার চেষ্টা করেছেন, তেমনি একথা প্রায ধরে নেওযা যায় যে আমাদেব মধ্যে যাঁরা ধূমপাযী তাঁরা জীবনে অন্তত একবারও ধূমপান ছেড়ে দেবার চেষ্টা কবেছেন। কেউ সিগারেট ছেড়ে নস্যি ধবেছেন, শেষে দেখা গেছে দুটোই ধরে আছেন। তামাক যে মনের উপর কি ভযানক প্রভাব বিস্তার করে তা এই সব তামাক ছাড়ার ব্যর্থ চেষ্টা থেকেই বোঝা যায়।

তামাক হচ্ছে আরব্য উপন্যাসেব সেই বৃদ্ধ, সিন্দবাদ নাবিকের ঘাড়ে যে চেপে বসেছিল কায়েমিভাবে। এক ভদ্রলোকের তামাকত্যাগের চেষ্টা সম্বন্ধে একটা গল্প শুনেছিলাম। সম্ভবত ইংবেজি গল্প। তিনি প্রথমে ঠিক করলেন, সিগারেট ধরাতে ইচ্ছা হলেই নিজেকে প্রশ্ন করবেন এখন না ধরালে কি চলবে না ?—কিন্তু তাঁর অন্তরাত্মা সব সময়েই উত্তর দিতেন. "না চলবে না।" তারপর তিনি ঠিক করলেন, যে পযসার সিগারেট খান সে পয়সা দান করবেন তা হলে ধূমপানের অভ্যাস নষ্ট হবে। তিনি দান করতে শুরু করলেন। দানের কথা প্রার্থীমহলে প্রচাব হযে গেল, দানেব পরিমাণ অত্যন্ত বেড়ে গেল—শেষে আব কুলোতে পাবেন না। তখন দান ছেড়ে আবাব সিগাবেট ধরলেন। তারপর ঠিক করলেন সিগারেটের কথা ভুলে যাওযার চেষ্টা করবেন এবং সে জন্য অন্য কোনো বিষয়ে নিজেকে সব সময নিযুক্ত রাখবেন। এই প্রতিজ্ঞা এমন দৃঢ় হল যে প্রায় দশমিনিট পব পর তাঁব মনে পড়তে লাগল যে সিগারেট খাওয়ার কথা ভুলে যেতে হবে। ফলে যতবার মনে পড়তে লাগল ততবারই একটা ক'রে সিগারেট ধবাতে হল। এই ভাবে সিগারেট ছাডার সাধনা করতে করতে তিনি একদিন সফল হলেন। আত্মধিক্কারের হাত থেকে নিজেকে বক্ষা করার জন্যই তাঁকে সিগারেট ছাড়তে হল। এ জন্য খরচ কিছু বাড়ল বটে কিন্তু তবু নিজেব সংকল্প বক্ষা করতে পেরেছেন বলে তাঁর পবম তৃপ্তি হল। খরচ বাড়ল সিগারের জন্য। তবে প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্য সিগারেট তিনি আর খাননি।

ধূমপান ছেড়ে দেওয়া সফল হয় অনেকের এই ভাবেই। তামাকের অভাবে কেউ ক্ষেপে গিয়ে মানুষ খুন করেছেন কিনা জানি না, তবে সময় মতো তামাক খেতে না পেযে আত্মহত্যার প্রবৃত্তি জেগেছে এমন অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে।

মানুষ অমৃতের পুত্র কিন্তু তার জীবনের উপর প্রবল প্রভাব হচ্ছে বিষের। আসলে বিষকেই আমরা অমৃত বলে থাকি।

আমার কথা যে সর্ববাদীসম্মত হবে এমন আশা করা যায় না, কেননা বিষকে বিষ বলে মানার দুর্বলতা অনেকেরই আছে। পৃথিবীর সব দেশেই একদল মনীষী আছেন তাঁরা এখনও ধূমপান-বিরোধ আর একদল আছেন তাঁরা কর্মপ্রেরণা পান ধোঁয়া থেকেই। তবে যাঁরা ধূমপান কখনও করেননি তাঁরা যদি বলেন তামাক বিষ তা হলেই লোকের সন্দেহ হবে। আর বোধ হয় ঠিক এই কারণেই ধূমপায়ীর সংখ্যা ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। ধূমপান-বিরোধীর কাছে তামাক যত তুচ্ছ বলে মনে হচ্ছে, ধূমপায়ীদের কাছে তামাক ততই অসামান্য বলে মনে হচ্ছে। তামাককে যদি স্থায়ীভাবে তুচ্ছ বস্তুর তালিকায় স্থান দেওয়ার ইচ্ছা থাকে তা হলে তামাক ব্যবহারকারীদের মধ্য থেকেই কাউকে আন্দোলন চালাতে হবে। ঘোর তামাক-সেবী যেন বলেন, তামাক তুচ্ছ, তামাক সামান্য, তা হলে হয় তো তামাক স্থায়ী ভাবে তুচ্ছ হতে পারে। তবে একমাত্র ভয়, তখন তামাক-বিরোধীরা দল বেঁধে তামাক ব্যবহার শুরু করবেন এবং বলবেন তামাকের তুল্য জিনিস নেই।

(১৯৪৩)

বিজ্ঞাপন

খবরের কাগজে খবর থাকে, বিজ্ঞাপনও থাকে। কিন্তু এমন লোকের কথা শোনা যায়, যিনি খবর পড়েন না শুধু বিজ্ঞাপন পড়েন। তাঁর কৈফিয়ৎ হচ্ছে খবর রোজ একই থাকে। ঘটনা যা ঘটে, প্রতিদিন সব একই ঘটে, শুধু যাদের নিয়ে ঘটে, তাদের নাম থাকে আলাদা। পঁচিশ বছর আগে ভজহরি ট্রেনে কাটা পড়েছিল। আজও সেই ট্রেনে কাটার খবর, নামটা শুধু ভজহরি নয়, কেষ্টহরি। প্রত্যেক দিন নাম বদলে বদলে ঐ একই খবর তার পড়তে ভাল লাগে না। তাই তিনি বিজ্ঞাপন পড়েন। তা-ছাড়া খবরের একটা চেহারা প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। তা থেকে দেশকে ঠিক চেনা যায় না। দেশের নাড়ির খবর তাতে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় বিজ্ঞাপনে।

সাহিত্য যদি জীবনের প্রতিবিম্ব হয়, তা হলে একমাত্র বিজ্ঞাপনই সেই সাহিত্য যাতে সমাজ-জীবনের সম্পূর্ণ ছবিখানি দেখা যায়। অনেকেরই এই মত। একজন বলেন—ধর না কেন, এই সোনার বাজারের বিজ্ঞাপন দেখে আমি দুনিয়া কোন্ পথে চলেছে তা বুঝতে পারি। যখন দেখি সোনার দর চড়ে যাচ্ছে তখন বুঝি যুদ্ধ এগিয়ে আসছে। সোনার দর কমলেই বুঝি যুদ্ধের ভয় আপাতত কমে গেল।

কিন্তু এ-তো গেল দুনিয়ার মতিগতি। দেশকেও জানতে পারি বিজ্ঞাপন পড়ে। পঁচিশ বছর আগের একটি বিজ্ঞাপন আজও আমি ভুলতে পারিনি। তাতে ছিল একজন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক চাই—যিনি ইংরেজী, বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস এবং ভূগোল এই পাঁচটি বিষয়ে স্ট্রং। বেতন পঁচিশ টাকা। পাঁচটি বিষয়ে স্ট্রং বা শক্তিমান হবেন, বি-এ পাস করবেন এবং পাবেন পঁচিশ টাকা। সমাজের মর্মান্তিক একটি দিকের চেহারা। একটি যুবক পাঁচটি বিষয়ে স্ট্রং হয়ে বি-এ পাস করেছে। কত আশা-আকাঙ্ক্ষা তার ছিল। স্কুলে পড়বার সময় তার জীবনের লক্ষ্য কি তা নিয়ে নিশ্চয় সে রচনা লিখেছে, সে বড় একটা কিছু হবে। জজ ম্যাজিস্ট্রেট বা ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার হবে বা ঐ রকম চাকরি বা ব্যবসা অবলম্বন করবে। সে-জন্য এতগুলো বিষয়ে সে স্ট্রং হয়েছে। তারপর কি হল? তার স্বপ্ন ভেঙে গেল। এখন সে কর্মখালির বিজ্ঞাপন পড়ে পড়ে আবেদন পত্র পাঠাচ্ছে।

তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। পঁচিশ টাকা মাসে? মন্দ কি? কিন্তু সে

চাকরিও কি সে পাবে? হয় তো পাবে না। হয় তো যে পাবে সে ছ বিষয়ে স্ট্রং। ষষ্ঠ বিষয় হচ্ছে দেহ। শক্ত পেশী তার সর্বাঙ্গে। সে ছেলেদের শরীর চর্চা করাবে, অতিরিক্ত তাই সে পাবে! কিন্তু পঁচিশ টাকার জন্য কি এত গুণী লোক দরখাস্ত পাঠাবে? তার জানা আছে এ রকম বিজ্ঞাপনে অন্ততঃ পাঁচ-শ আবেদন পত্র আসে। এই নির্দিষ্ট পদটির জন্যও ঐ রকমই হয়েছিল। তিনি খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন। শুধু দরখাস্ত নয়, আবেদনকারীরা সবাই নির্দিষ্ট ঠিকানায় উপস্থিত হয়েছিল এবং হাতাহাতি পর্যন্ত করেছিল নিজেদের মধ্যে। হয়তো চাকরিটি জুটেছিল ছ বিষয়ে স্ট্রং ব্যক্তির ভাগ্যেই।

পঁচিশ বছর আগে শিক্ষকদের বিজ্ঞাপন অনেক বেশি থাকত। বি-এ পাসের দর পনেরো টাকা পর্যন্ত নেমেছিল। এখন শিক্ষকদের বিজ্ঞাপন আগের মতো নেই। বেতনও আগের চেয়ে বেশি।

বিয়ের বিজ্ঞাপনও এখন বদলে যাচ্ছে। আগে ঘটকের বিজ্ঞাপন থাকত বেশি এখন বিবাহার্থী নিজেই বিজ্ঞাপন দিচ্ছে বেশি। আগে মোটামুটি একটা পণের অঙ্ক লেখা থাকত। চাকরির বাজারে যার দাম পঁচিশ টাকা, বিয়ের বাজারে তার দাম পাঁচ হাজার টাকা প্রায় বাঁধা ছিল। এখন পণের প্রস্তাব অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট থাকে। তার মানে মেয়েদের প্রতি আগে যে একটা কৃপার ভাব ছিল, সেটা এখন অনেকখানি কেটে গেছে, এখন একটু যেন চক্ষুলজ্জা এসেছে। মেয়েরা শিক্ষিত হওয়াতে এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিষয়ে অনেকখানি এগিয়ে যাওয়াতে বিজ্ঞাপনে এই রকম অপমানকর ভাষা এখন ক্রমেই কমে আসছে। মেয়েদের দিক থেকেও অনেকখানি উন্নতি দেখা যায়। পঁচিশ বছর আগেও যদি কোনো দেবতা এসে কোনো মেয়েকে বলতেন, মা লক্ষ্মী, আমি বর দিতে এসেছি, কি বর চাও?—তা হলে বিনা দ্বিধায় মা-লক্ষ্মী বলত, আই-সি-এস বর চাই।

মেয়েদের দৃষ্টিতে এখন বাইরের আকর্ষণ, এমন কি টাকার আকর্ষণও যেন কমে আসছে। এখন মানুষে মানুষে মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। এই পরিচয়ই হয়তো এখন বেশি দামী।

পরিবর্তনশীল সমাজের খাঁটি চেহারা এইভাবে ফুটে ওঠে বিজ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে। সমাজের আর একটি স্তরের পরিচয়ও বেশ পাওয়া যায়, এই স্তরে আছে চোরদের দল। চোরদের বিজ্ঞাপনও কাগজে দেখা যাবে নিয়মিত। যেমন, কোনো তেলের সঙ্গে দশ বিশ রকম উপহারের বিজ্ঞাপন। এই উপহারের তালিকায় টয় রিস্ট-ওয়াচ নামক একটি লোভনীয় হাতঘড়ির উল্লেখ থাকে। টয় রিস্ট-ওয়াচ। ইংরেজী

অনভিজ্ঞ মনে করে 'টয়' বোধহয় প্রস্তুতকারকের নাম। টয় কথাটি অনেক দিন চলেছিল বাংলাদেশেই। তারপর যখন সাধারণ লোকেরা বার বার প্রতারিত হয়ে 'টয' মানে খেলনা বুঝতে পারল, তখন টয়ের বদলে চলল ডামি রিস্ট-ওয়াচ। ডামি মানেও তাই, অর্থাৎ অকেজো, নকল। বেশ কিছুকাল চলল ডামি কথাটা। তারপর প্রতারিতরা ডামি কথাটিরও অর্থ বুঝে ফেলল। তখন ডামি কথাটি অচল হল এবং তার বদলে এলো মিউট রিস্ট-ওয়াচ। মিউট মানে মূক, নির্বাক। মিউট ঘড়ি মানে যে ঘড়িতে কোনো শব্দ হয় না। টয়ের যুগ গেল, ডামির যুগ গেল, এখন মিউটের যুগ চলছে। চোরের কৃপায় সাধারণ লোকের মধ্যে এই ভাবে ইংরেজী ভাষায় প্রসার হচ্ছে অবশ্যই।

এই বিজ্ঞাপন থেকে আরও একটি বিষয় জানা যায়। সেটি হচ্ছে এই যে বাংলার চোরি টয ও ডামি পর্যন্ত এগিযে ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে। তারপর থেকে অর্থাৎ মিউট শব্দ থেকে এ ব্যবসা গেছে অন্য প্রদেশের হাতে। এখন মিউট ঘড়ির যত বিজ্ঞাপন দেখা যায তা সবই বাইরের। এটাই এখন একমাত্র সান্ত্বনা যে, বাঙালী এ ব্যবসা ছেড়ে দিযেছে। আগে কলকাতার চোরেরা মফঃসলের লোকদের ঠকাত, এখন মফঃসলের চোরেরা কলকাতার লোককে ঠকাচ্ছে।

ভাগ্য গণনা বা মাদুলির বিজ্ঞাপন থেকেও দেশের চেহারা খুব চমৎকার জানা যায। যখন দেখা যায এই জাতীয় বিজ্ঞাপন খুব বেড়ে গেছে, তখন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে লোকের দুর্দশা চরমে উঠেছে। যখন বুদ্ধিতে আর কিছু সে করতে পারে না, দিশেহারা হযে পড়ে, তখনই তো তার দৈব নির্ভরতা। চিন্তাশক্তি যখন প্রায় লুপ্ত তখন ভাগ্যগণনা ও মাদুলি ভিন্ন গতি নেই।

বিজ্ঞাপনের সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল্য এত। যত দিন যাবে ততই সমাজ-বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকেরা পুরাতন বিজ্ঞাপন ঘাঁটবেন সমাজ ইতিহাসের মাল-মশলা সংগ্রহ করতে। বিজ্ঞাপন এ বিষযে সচেতন, তাই তার সংখ্যাও দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। তাই খবরের কাগজে খবরের চেযেও বিজ্ঞাপন বেশি হবার দিকে ঝুঁকেছে। শুধু কাগজে নয়, পথে, ঘাটে, গাড়িতে, বাড়িতে, দেয়ালে, গাছে, ল্যাম্প-পোস্টে, সর্বত্র বিজ্ঞাপন। চোখ চাইলেই চোখে পড়বে ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, উপরে, নিচে সব জায়গায় বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন কাগজবাহিত হযে ঘরে ঢুকছে, দেশলাইয়ের বাক্স-বাহিত হযে পকেটে ঢুকছে। ঘরে বাইরে গোপনতম এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে সে যাযনি এবং প্রতিমুহূর্তে পৃথিবীর সকল দেশ থেকে বিজ্ঞাপন এদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করছে। এই বিজ্ঞাপন না থাকলে অন্তত শহরের চেহারা বদলে

যেত, খববের কাগজ কেউ কিনত কিনা সন্দেহ। শহরেব পথে পথে এমন বিচিত্র বিজ্ঞাপন চোখে না পড়ে উপায় নেই এবং এই বিজ্ঞাপনের জন্যই পথের দৈর্ঘ্য বেড়ে গেছে একথা বৈজ্ঞানিকেরা হিসেব ক'বে বার করেছেন। আগে বিজ্ঞাপনহীন পথের এক মাইল যেতে যত সময় লাগত, এখন বিজ্ঞাপনশোভিত পথেব এক মাইল যেতে তাব চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগে। কেন লাগে তা যে কেউ একটু ভাবলেই বুঝতে পারবেন।

সব বিজ্ঞাপনই আবার নীরব নয়। সন্ধ্যাবেলা দেখা যাবে অনেক ওষুধ বিক্রেতার মুখে বিজ্ঞাপন শব্দায়িত হয়ে উঠেছে। রেলগাড়িতে তো সর্বক্ষণ সশব্দ বিজ্ঞাপন রেলযাত্রীব জীবনে বৈচিত্র্য আনছে। ভাগ্যিস শহরের সকল বিজ্ঞাপন শব্দায়িত নয়। কিন্তু যদি হত যদি দৈবাং সকল বিজ্ঞাপন একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠার ক্ষমতা লাভ কবত, তা হলে সেই দিনই শহর ধ্বংস হয়ে যেত কিনা কে জানে।

(১৯৫২)

গালুডি

গল্প শুনেছি এক ইংরেজ পল্লীগ্রাম খুঁজে বার করবার এক চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনি যখন পল্লীর পথে রওনা হতেন তখন পিঠে কোনো পরিচিত সিনেমা স্টারের ছবি ঝুলিয়ে নিতেন। পথের লোক তা দেখে কেউ অবাক হত কেউ বা হাসত, কিন্তু কেউ কোনো প্রশ্ন করত না। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত তিনি চলতে থাকতেন। যেখানকার লোকেরা প্রশ্ন করত 'এটি কার ছবি?" সেই স্থানটিকেই তিনি তৎক্ষণাৎ প্রকৃত পল্লীগ্রাম বলে বুঝতে পারতেন।

কিন্তু আমার পরীক্ষা অন্য রকম। আমার যখন শহরের বাইরে যাবার ইচ্ছা হয় তখনই এমন একটা জায়গা বেছে নেবার চেষ্টা করি যেখানে খবরের কাগজ পাওয়া যায় না। জায়গাটা প্রকৃতই পল্লী কিনা আমার মতে সেটা তার একটা প্রমাণ। খবরের কাগজ পাওয়া যায় না এমন জায়গা অবশ্য কল্পনা করা কঠিন কিন্তু এমন জায়গা অনেক আছে। গালুডির একটি প্রান্ত এই রকম একটি জায়গা।

কিন্তু আমার এমন জায়গায় যাবার বাসনা হয় কেন? মনকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছি। খবরের কাগজের অপরাধ নেই। খবরের কাগজে যত খবর থাকে তা সবগুলো একসঙ্গে কারোই সমান দরকার হয় না। তবু খবরের কাগজ প্রতিদিন পৃথিবীর একটা মোটামুটি চেহারা আমাদের চোখের সম্মুখে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। আমরা কোন্ অবস্থায় আছি, আমাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা কি হতে যাচ্ছে এ সব আমরা তা থেকে জানতে পারি। পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এখন ঘনিষ্ঠ। ইউরোপে যদি যুদ্ধ বাধে তা হলে আমরা তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ব। আগে থেকে সাবধান হবার সুযোগ পাওয়া যায়। যদি যুদ্ধ বাধতে বাধতে হঠাৎ খবর আসে মতভেদ দূর হয়ে গেছে, যুদ্ধের ভয় দূর হয়ে গেল, তা হলে আমরা পরম তৃপ্তিলাভ করতে পারি। কোরিয়াকে কেন্দ্র ক'রে বিশ্বযুদ্ধ লাগে লাগে, এমন আশঙ্কা দিনের পর দিন আমরা খবরের কাগজে পড়েছি। যুদ্ধ বাধলে দেশের কি দুরবস্থা হয় তা আমরা অন্তত গত যুদ্ধে টের পেয়েছি। তাই বর্তমানে যে দুরবস্থা চলেছে (যুদ্ধ থামার পরেও) তা আমরা এই খবর থেকে সহ্য করার ধৈর্য লাভ করেছি। ভেবেছি এর চেয়েও দুরবস্থা ঘটবে, অতএব এখন যথেষ্ট সুখে আছি। নইলে ধৈর্য হারিয়ে ফেলতাম।

খবরের কাগজ না থাকলে সমাজের চেহারা অন্য রকম হত। টাটকা উত্তেজনাপূর্ণ সব খবর লোককে সর্বদা তৎপর ক'বে রাখে অন্তত মনের দিক দিয়ে। সংক্রামক ব্যাধি দুর্ভিক্ষ চুরি ডাকাতি জুয়াচুরির নিত্য নূতন খবর। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কাব এবং বৈজ্ঞানিক জুয়াচুবি দুয়েব খববই লোকেব সমান কাজে লাগে। কোথায় তিন মাথা সন্তান ভূমিষ্ঠ হল, কোথায় ছ'পা-ওয়ালা বাছুর জন্মাল এসব খবর মূল্যবান হয়ে দেখা দেয খবরের কাগজে। সীমাবদ্ধ কয়েকটি পৃষ্ঠার পটভূমিতে প্রতিদিন প্রায় একই ধরনের বাছাই করা খবর ফুটে ওঠে। এই সব খবর শিল্পীর হাতের এক এক-খানি ছবিব মতো। একটি লোক জনতার মধ্যে আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায। কিন্তু সেই একটি লোককে যখন জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে শিল্পী আমাদেব দৃষ্টিগোচর করান তখন তা দেখে আমরা মুগ্ধ হই। তেমনি এক একটি পূর্বাপর বিচ্ছিন্ন খবর যখন খবরের কাগজে ফুটে ওঠে—তখন তা আমাদের চোখে কত বড় হয়ে দেখা দেয়। এইভাবে কতকগুলি বিশেষ জাতীয় মানুষ অথবা ঘটনাকে বার বার বড় ক'রে তোলাতে স্বভাবতই আমাদের মনে হয় পৃথিবীতে এই সব মানুষ অথবা ঘটনাই একমাত্র সত্য এর বাইরে আর কোনো উল্লেখযোগ্য সত্য নেই। তাই খবেব-কাগজের-সত্য-দেখায-অভ্যস্ত চোখেব সরলতা দুর হযে গেছে, খবরের কাগজেব জগতে বাস ক'রে ক'রে মানুষের মুখের প্রশান্ত ভাব আর নেই। তার মানুষকে ভালবাসার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে। কোনো অপরিচিত শ্রদ্ধেয় লোককে দেখলেও তাকে প্রথমেই সে চোর বলে সন্দেহ কবে। তার দৃষ্টি সদা জাগ্রত, সদা সতর্ক। তারপব সেই শ্রদ্ধেয় লোককে তাঁর ব্যবহারে প্রমাণ করতে হয় যে তিনি চোর নন, সাধু।

আমবা জানি কোনো জাযগাব নিসর্গ দৃশ্যের রূপান্তর ঘটে সেইখানেব অধিবাসীর দ্বারা। সেইখানেব পাবিপার্শ্বিকে তার চিহ্ন আঁকা হয। যেখানে মানুষ বাস কবে সেখানে সে ঘব বাঁধে, জমিচাষ কবে, তাব পাযে চলার পথ আঁকা হয় সেই মাটিব বুকে। যেখানে পাহাড় সেখানে পাহাড়েব গাযে চাষের চিহ্ন থাকে। যেখানে বাঘ থাকে সেখানে বাঘেব পায়ের চিহ্ন থাকে, শিকাব কবা জন্তুর হাড়গোড় পড়ে থাকে। যেখানে উই বাস করে সেখানে উইয়েব ঢিবি থাকে। এইভাবে নিজ নিজ স্বভাব অনুযাযী প্রাণীমাত্রেই নিসর্গ দৃশ্যের চেহারা অল্পবিস্তর পরিবর্তন ক'রে থাকে। দেখলেই বোঝা যায়। তেমনি যেখানে খবরের কাগজ আসে সেখানকার লোকের মুখ দেখলেই তা বোঝা যায়। চোখে উজ্জ্বল চতুরতা, সন্দেহের তির্যক ভঙ্গি। পৃথিবীর সব কিছু জানি এই রকম একটা আত্মতৃপ্ত ভাব। বয়স্কদের মধ্যে খবরের

কাগজের প্রতিক্রিয়া আরও বেশি। কাগজের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা তাঁরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন এবং পৃথিবীর দৈনন্দিন রূপটি হৃদয়ে গেঁথে নেন। তারপর সমবয়স্কের সঙ্গে দেখা হলে "ওহে শুনেছ"—দিয়ে কখনো সরস কখনো শঙ্কিত বাক্যালাপ শুরু করেন। অর্থাৎ পাঠকদের প্রত্যেকের কাছেই খবরের কাগজের রচিত রূপই পৃথিবীর রূপ বলে বোধ হয়। পরবর্তী যুদ্ধের সম্ভাবনা চিরকাল থাকবে এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়; রেল কলিশন, বিমান দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড পৃথিবীব্যাপী নিত্য ঘটনা বলে মেনে নিই, তিনমাথা শিশু ছ'পা বাছুরে সংসার ছেয়ে গেল বলে ধারণা হয়।

কিন্তু তবু খবরের কাগজের বাইরে একটা বড় জগৎ আছে—সেটিই আসলে বৃহত্তর জগৎ—অথচ তার অস্তিত্বই আমরা ভুলে থাকি। এ জগতে শুধু যে খবরের কাগজ পৌঁছয় না তাই নয়, এখানকার কোনো খবরও খবরের কাগজে পৌঁছয় না। এখানকার লোকদের দৃষ্টি সবল, বিস্ময়পূর্ণ, আমরা তাদের কাছে বিস্ময়। ভয়েরও বটে। সভ্য লোকের কাছে তাদের অনেকেরই সঙ্কোচ।

আমি যেখানে (ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্যের) বাংলোয় বসে এই কথাগুলো লিখছি তার সম্মুখে দিকচক্রের মতো প্রায় চতুর্দিকে পাহাড়শ্রেণী—বহুদূরে কুয়াসায় প্রায় বিলীন। খুব কাছেই একটি ছোট পাহাড়। বৃক্ষবিরল মাঠ। দূরে দূরে ছোট ছোট এক একটা গাছ বা গাছের গুচ্ছ। তিনশ গজ দূরে ছোট একখানি লাল টালির ঘর। ছবির মতো দেখাচ্ছে। তার সামনে একটা ডোবায় খানিকটা জল জমে আছে। উঁচু নিচু পথ। মাঝে মাঝে একজন কি দুজন লোক দু একটা গোরু নিয়ে চলেছে। ছোট পাহাড়টির উপর দুটি রাখাল ছেলে গোটাকত ছাগল চরাচ্ছে। খাটো চিকন এক এক গুচ্ছ বাঁশ এই পাহাড়টির কটিদেশ স্তরে স্তরে বেষ্টন ক'রে আছে। আজ প্রায় সমস্ত দিন ধরে মাত্র বিশপঁচিশ জন লোক এই পাহাড়িয়া লাল মাটির পথে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে গিয়ে মিলিয়ে গেছে।

একটি দুটি গোরু গোটাকত ছাগল আর জনকত অখ্যাত মানুষ, এরা এ জগতে অতি তুচ্ছ ঘটনা। এটি সংবাদই নয়। তিনমাথা শিশু বা ছ'পা গোরুর জগৎ থেকে এরা বিচ্ছিন্ন। এখানে প্রত্যেকটি মানুষের একটি ক'রে মাথা, এবং প্রত্যেক গোরুর চারখানা ক'রে পা। জনবিরল এই যে পাহাড়িয়া ভূমি এর মধ্যেও কোনো নতুনত্ব নেই।

অথচ এই বিরাট পটভূমিতে একটি দুটি প্রাণী সমস্ত নিসর্গ দৃশ্যকে কি সুন্দরই না করেছে। সংবাদ হিসাবে মূল্যহীন, কিন্তু ছবি হিসাবে এর মূল্য ধারণাই করা যাবে না।

পেঁজা তুলোর মতো লঘু মেঘ আকাশময় ছড়ানো, পশ্চিম আকাশ থেকে পূব আকাশের দিকে অতি ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। সূর্যের আলোয় মেঘ যত উজ্জ্বল আকাশ তত নীল দেখাচ্ছে। কাছের পাহাড়টির গায়ে নানা রঙের খেলা। সুরকি-রঙ পাহাড় ঘিরে হাল্কা সবুজ ঝোপের বেষ্টনী। বাঁশের ঝোপগুলো হাল্কা সবুজের সঙ্গে সোনালি মিলে আশ্চর্য সুন্দর। পাহাড়ের গায়ে গায়ে বড় বড় শাদা পাথর খণ্ড গাঁথা। যেন শঙ্খের মালা পরে আছে কণ্ঠে, মেখলায়। ধাপে ধাপে ধাপচাষের দাগ কাটা। পাহাড়টির বাঁ পাশে দিগন্তরেখা পর্যন্ত অবাধ বিস্তৃত মাঠ। লাল সোনালী সবুজ হলুদ রং সব এলোমেলো ছড়ানো, অথচ কি সুষমামণ্ডিত। দূরে অস্পষ্ট ঘননীল পাহাড়ের বেষ্টনী, তারই সম্মুখে এই রঙের খেলা। এই হচ্ছে পটভূমি। এরই বুকে একখানা খালি গোরুর গাড়ি ডোবার ধার দিয়ে আঁকাবাঁকা পথে কোন্ অজানা পল্লী থেকে বেরিয়ে কোন্ অজানা লক্ষ্যে চলেছে। এই যে ছবি,-উন্মুক্ত প্রকৃতির বুকে ছোট্ট একখানি ভাঙা গোরুর গাড়ি, দুটো গোরুতে টেনে নিয়ে চলেছে, একটি অনাবৃতদেহ বৃদ্ধ গাড়িটি চালিয়ে নিয়ে চলেছে, এরই জন্য প্রকৃতির এতদিনের আয়োজন। এ ছবি দেখলে গোপাল ঘোষের তুলির কথা মনে পড়ে। যে রঙের শুধু আভাস আছে, ইঙ্গিত আছে, তা শিল্পীর মনে সম্পূর্ণ ধরা দেয়। আমাদের শুধু অভিভূত করে।

এইখানে খবরের কাগজ ভাল্‌গার। মনেও পড়ে না। আর সে জন্যই এমন জায়গায় আসতে ইচ্ছে করে। খবরের কাগজ-বহির্ভূত জগতের সঙ্গে এখানে মুখোমুখি পরিচয়।

সন্ধ্যা হয়ে এলো। আবহাওয়া শুষ্ক ছিল হঠাৎ পূব দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। গাছপালায় আনন্দ জাগল, শুকনো পাতা এক ধার থেকে আর এক ধারে ছুটে চলেছে, ঝন্‌ঝন্ শব্দ উঠছে চার দিকে। পশ্চিম আকাশে সোনা ছড়িয়ে দিয়েছে। দূরের পাহাড়-বেষ্টনী হঠাৎ বেগুনি হয়ে উঠল। সূর্য অস্ত গেল। অন্ধকার আকাশে ফুটে উঠল আর এক রহস্যময় জগৎ। এখানে আকাশে এত তারা। সব স্পষ্ট। উত্তরে দিগন্তের দিকে পুচ্ছ হেলিয়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল জ্বলছে। ধ্রুবতারা নির্মল রূপে দেখা দিয়েছে। প্রায় মাথার উপরে কিঞ্চিৎ দক্ষিণদিকে সিংহরাশি, কাছাকাছি কালপুরুষ। আরও কিছুক্ষণ পরে পূব আকাশে বিরাট বৃশ্চিকরাশি মাথা তুলছে। এত তারা এবং এত স্পষ্ট। কলকাতার আকাশে দেখা যায় না।

হঠাৎ পশ্চিম আকাশে দিগন্ত ভেদ ক'রে আর এক আলো ফুটে উঠল। আর

এক জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব। সমস্ত আকাশ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সোনালি আলোয়।

দূরের টাটা কারখানার গলিত ইস্পাতের আলো। উত্তর দিকেও আব এক আলোর খেলা। পাহাড়ের গলায় আলোর সাতনরী হার। পাহাড়ের জঙ্গল পুড়িয়ে চাষের জায়গা করা হবে শুনলাম। স্তরে-স্তরে সুদীর্ঘ আগুনের বেষ্টনী।

সম্পূর্ণ একা বসে আছি খোলা বারান্দায়। মন নানা কল্পনায় মেতেছে। একবার মনে হল এই নির্জন অন্ধকারে যদি একদল ডাকাত এসে আক্রমণ করে তা হলে সে বেশ একটা রোম্যান্টিক ব্যাপার হবে। ডাকাতদল মশাল হাতে হারেরেরে ক'রে পড়বে আমার ঘাড়ে। রোমান্সের কল্পনায় রোমাঞ্চ জাগল। বলা বাহুল্য সেটি ঠিক আনন্দজনিত রোমাঞ্চ নয়।

অনেক রাত্রে আমার সঙ্গীরা ফিরে এলেন। তাঁরা শুনে এসেছেন কিছুদিন আগে অন্য বাসিন্দারা থাকতে এই বাড়িতে বড় রকমের একটা ডাকাতি হয়ে গেছে।

পরদিনই সকালে কলকাতা রওনা হতে হবে ঠিক হয়ে গেল। তার আরও কারণ আমি এই প্রথম হাওয়া বদলাতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছি, যাকে বলে শয্যা-শায়ী তাই। এসেছিলাম অবশ্য সুস্থ শরীরে। (১৯৫২)

রবীন্দ্র শিল্প প্রসঙ্গ

রবীন্দ্র-শিল্প এ আলোচনার উপলক্ষ্য মাত্র। কারণ যে-কোনো আর্ট আলোচনার পূর্বে আর্ট সম্পর্কে আমাদের মোটামুটি একটা ধারণা হওয়া দরকার। আর্ট আমি সঙ্কীর্ণ অর্থে শুধু চিত্র-শিল্প সম্পর্কেই ব্যবহার করছি।

আমরা নানা প্রদর্শনীতে যে-সব পেন্টিং বা চিত্র শিল্প দেখি তার মধ্যে অনেক ছবি দেখি যা আমাদের পরিচিত প্রাণী বা অন্য কোনো জিনিসের নিখুঁৎ চিত্র, আবার এমন অনেক ছবি দেখি যা পরিচিত প্রাণী বা বস্তুর আভাস মাত্র বহন করে। আবার অন্যত্র অনেক আধুনিক চিত্রের মুদ্রিত প্রতিলিপি দেখি (কারণ এমন প্রদর্শনী দেখিনি) যা শুধু নানা বিচিত্র রেখা ও বর্ণের সুন্দর বিন্যাস মাত্র, তাতে পরিচিত জগতের কোনো বস্তুরই কোনো আভাস নেই।

কিন্তু কেন এমন হয়? চিত্র-শিল্পীদের মধ্যে এ রকম বিভিন্নতা কেন? কেন আমরা যা জানি বা চিনি তাই আঁকা হয় না? এবং কেন শুধুই এমন ভাবে আঁকা হয় না যা পরিচিত জিনিসের ভ্রান্তি ঘটাতে পারে? শিল্পীদের মধ্যে এই মতভেদ কেন? এ সব প্রশ্ন আমাদের অনেকেরই মনে আসে।

এর উত্তর দিতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, পরিচিত হোক অপরিচিত হোক বা অল্প পরিচিত হোক, শিল্পী যে রূপই গড়েন আর্টের ক্ষেত্রে তারই একটা নিজস্ব দাবী আছে। সেই রূপটি কিছুর সঙ্গে মিলুক বা না মিলুক, রেখা বা বর্ণ-বিন্যাসে তা কোনো একটা নির্দিষ্ট আকার যদি পায়, তা হলে তাকেই রূপ বলে মানতে হবে। সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। তাকে চোখের সম্মুখে অব্যবহিত ভাবে দেখছি। অতএব তা সত্য। তার নিজস্ব চেহারার অধিকার নিয়ে সে আছে। আর্ট সৃষ্টিতে এই চেহারা একটা গড়তেই হবে। পরিচিত জিনিসের অনুকরণ হোক বা খেয়ালি কতকগুলো আকৃতি হোক, আর্ট সৃষ্টিতে এর যে-কোনো একটি দিয়ে শুরু করতেই হবে। এই চেহারা সম্পূর্ণ মন থেকে গড়া হলেও তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই, যদি তা আমাদের চোখকে তৃপ্ত করে। কোনো কিছুর সঙ্গে না মেলা এ-ক্ষেত্রে অপরাধ নয়। মানুষ যেমন প্রকৃতির বুকে নিজস্ব স্বতন্ত্র চেহারার জোরে স্থান পেয়েছে। মানুষ আর কিছুর সঙ্গে মেলে না বলে আমরা দুঃখিত হই না। কারণ মানুষের

একটি স্বয়ংসম্পূর্ণতা আছে। প্রকৃতির বুকের দৃশ্যমান সমস্ত প্রাণী উদ্ভিদ বা বস্তু সম্পর্কেই এই কথা খাটে।

কিন্তু আর্টের ক্ষেত্রে যেখানে সৃষ্টির পিছনে রচয়িতার একটি সচেতন মন কাজ করছে সেখানে আমরা তাঁর গড়া খেয়াল প্রসূত যে-কোনো আকার বা রূপ বা ফর্মকে আর্ট বলি না। কেননা সেই আকার বা ফর্মটাই আর্ট নয়। বিশুদ্ধ ফর্মটাই যদি আর্ট হত, তা হলে যান্ত্রিক অথবা জ্যামিতিক ডিজাইনও আর্ট হত। আমাদের সৌন্দর্যবোধ ডিজাইনে যেটুকু তৃপ্তিলাভ করে তা অগভীর। কেননা, আর্টে আমরা ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেতে চাই। একটি গাছ দেখতে কেমন বা একটা পাখী দেখতে কেমন তা যে-কোনো নিপুণ কারিগর এঁকে দেখাতে পারে। প্রত্যেকেই নির্ভুলভাবে একই জিনিস আঁকবে।—সেখানে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় না। এ-রকম ছবিকে আমরা আর্ট বলি না। এ-রকম ছবি উদ্ভিদতত্ত্ব বা পাখীতত্ত্ববিদের কাজে লাগতে পারে—এর মাধ্যমে শিল্পীর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে দর্শকের যোগাযোগ ঘটে না। গাছ বা পাখী শিল্পীর লক্ষ্য নয় উপলক্ষ্য মাত্র। শিল্পী নিজের কোনো কল্পনা বা মনের বিশেষ একটা ভাব এ সবের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেন। অর্থাৎ নিজের ব্যক্তিত্বকেই প্রকাশ করেন। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, তা করতে গেলে হয় তাঁর হাতে পরিচিত জিনিসের রূপ পরিবর্তিত হবে, না হয় তার সঙ্গে অনেক কিছু যুক্ত হবে।

সুতরাং প্রত্যেক ছবিতেই শিল্পীর ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়বে এবং সে ছবি অন্য কোনো ছবির সঙ্গে মিলবে না। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় এক একটা জাতির মধ্যে শিল্পরূপের এক একটা ভঙ্গি গড়ে ওঠে। জাতির চরিত্রের সঙ্গে তা মিলে যায়। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব এতে চাপা পড়ে না, তবু মোটের উপর একটা মিল থাকে। একটা জাতির লোকের চেহারায় যেমন মিল থাকে, অথচ প্রত্যেকটি ব্যক্তিই স্বতন্ত্র। সে-জন্য এই পরিচিত ভঙ্গির ছবি আঁকলে লোকে তাতে সহজে আকৃষ্ট হয়। যেন তাতে একটা আরাম বোধ করে। আবার শুধু জাতি নয়, এক একটা সময়েও এক একটা ভঙ্গির জন্ম হতে পারে। প্রথমেই তা হয় তো জনপ্রিয় হয় না, কিন্তু কিছুকাল পরে জনপ্রিয় হয় অথবা তার আয়ু বেশি দিন থাকে না। এই কথাটি মনে রাখতে হবে। অর্থাৎ নতুন কোনো ভঙ্গি কোনো যুগের পক্ষে উপযুক্ত বিবেচিত হলে সেটি চিরস্থায়ী হবে এমন কোনা কথা নেই। আবার সে সঙ্গে পুরাতনটিও বাতিল হয়ে যাবে এমন নাও হতে পারে। ক্ষমতাবান শিল্পী যে ভঙ্গিতে নিজেকে বেশি প্রকাশ করতে পারেন বলে মনে করেন

সেটাতে তিনি লেগে থাকেন। এর মধ্যে অযৌক্তিক কিছু নেই, অন্তত এটাই স্বাভাবিক মনে হয়। শিল্পের কোনো রূপ-মাধ্যমই চরম বলে মানা উচিত নয়। জগতে চরম যা ultimate বা absolute বলে কিছু আছে কি না ধারণা করা শক্ত। তা ভিন্ন রুচি ও প্রয়োজনের প্রশ্নও এর মধ্যে আছে আর তা সর্ব্বদাই আপেক্ষিক ব্যাপার। এই প্রয়োজন হচ্ছে সৃষ্টির প্রেরণা। এই প্রেরণা না থাকলে আর্টের প্রশ্নই ওঠে না।

অনেকের ধারণা আর্টে শুধু আলোছায়া বিন্যাসজাত সৌন্দর্য থাকলেই যথেষ্ট। আর্টে তার বেশি আর কিছু চাই না। কিন্তু সৌন্দর্যতত্ত্ব ও দর্শকমনকে নানাভাবে বিশ্লেষণ ক'রে দেখা গেছে কথাটি আংশিক সত্য মাত্র। সম্পূর্ণ সত্য হলে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়, আর্ট সম্পর্কে দর্শকের মনোভাব ব্যাখ্যায় অনেকখানি অংশই বাদ পড়ে যায়। এতে শুধু ফর্মেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়। অনেকটা আধেয় অপেক্ষা আধারের প্রাধান্য দেওয়ার মতো হয়। শিল্পে অবশ্য আধেয় থাকতে গেলে আধার থাকতেই হবে, কিন্তু আধার থাকলে আধেয় নাও থাকতে পারে। যথার্থ শিল্পীর হাতে ও দুটি অবিচ্ছেদ্য—সম্পূর্ণ অবিচ্ছেদ্য।

আর্ট বিশ্লেষণে দুটি পৃথক ক'রে দেখার রীতি আছে মাত্র। অর্থাৎ এক-দিকে শিল্পীর কলা-কৌশল আর একদিকে শিল্পীর বাণী ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশ। সেটা শিল্পেরও বাণী বলা যেতে পারে। ফর্ম বা রূপ মাধ্যমের দিকেও অনেক বৈচিত্র্য আছে। আগেই বলা হয়েছে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব প্রকাশে যে রূপভঙ্গি উপযুক্ত তা নিয়ে তর্ক ক'রে লাভ নেই। শিল্পী কি বলতে চান, তার উপর নির্ভরশীল হয়েই ফর্মের বৈচিত্র্য আপনা থেকেই এসেছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথমে ধরা যাক সোভিয়েট প্রদর্শনীর মাক্‌সিমেনকো অঙ্কিত 'মাস্টার্স অব দি ল্যাণ্ড' নামক চিত্রখানি। এখানে বহুদূর বিস্তৃত জমির উপর খোলা আকাশের নিচে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। জমি, আকাশ ও মাটি যেমন দেখি প্রকৃতিতে এখানেও তেমনি, মানুষগুলোও ঠিক স্বাভাবিক মানুষের মতো। কিন্তু শুধু মাটি, আকাশ ও মানুষই এ ছবির শেষ কথা নয়। এ সমস্তকে ছাপিয়ে উঠেছে একটি গর্বিত ভঙ্গির মহিমা। জমির সঙ্গে এদের আত্মীয়তার ভিত্তি সুদৃঢ়, তাই পায়ের নিচে সুদৃঢ় মাটি। এদের গর্ব আকাশচুম্বী – তাই এদের মাথা উঠেছে আকাশে। এটাই হল এ ছবির মর্মকথা। হয় তো জীবনকে পার্থিব বাস্তব দৃষ্টিতে দেখায় এরা অভ্যস্ত বলেই এদের রূপমাধ্যমও বাস্তবধর্মী। এতে আপত্তি করবার কিছু নেই। সোভিয়েট সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা এখানে রূপায়িত হয়েছে।

রুচি নিয়ে যে দ্বন্দ্ব সাহিত্যে শিল্পে, সঙ্গীতে, এ সম্পর্কে একটা দিকের অন্তত গভীর জ্ঞানগর্ভ ইতিহাস পাওয়া যাবে ইংরেজ লেখক ই. ই. কেলেট লিখিত The Whirligig of Taste নামক বইতে। তাঁর মত আমাকে এ প্রবন্ধে একাধিকবার উল্লেখ করতে হবে। তিনি বলেন—"when a style has been established in a nation that very fact is a proof that there is some conformity between the style and the national character."

আমাদের দেশের শিল্প সম্পর্কে এই কথাটা ভাবলেই বোঝা যাবে যে, কথাটি সত্য।

এর সঙ্গে দেখা যাক নন্দলাল বসুর জন্মাষ্টমী নামক ছবিখানি। বসুদেব সদ্যোজাত কৃষ্ণকে নিয়ে রাত্রিবেলা ঝড়ের মধ্যে রওনা হচ্ছেন নন্দালয়ের উদ্দেশে। বসুদেবের মনের সমস্ত ভয়, সন্দেহ, ব্যাকুলতা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দ্বিধা, অথচ দৈবের উপর একান্ত ভরসা—এ সমস্ত ভাবটি তীক্ষ্ণ এবং ঘনীভূত হয়ে উঠেছে সামান্য একটুখানি জায়গার মধ্যে, বসুদেবের চোখে মুখে। কারাগারের বাইরে দুর্যোগময়ী প্রকৃতি এবং পশ্চাতে দেবকীর নিষ্পলক প্রশান্ত প্রার্থনা এই ভাবসমষ্টিকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। বসুদেবের মুখের ছবিটি শুধু থাকলেই শিল্পীর বাণী এ ছবিতে প্রকাশ হতে পারত, কিন্তু শিল্পী এর সঙ্গে কিছু পরিমাণ সংবাদ যুক্ত ক'রে ঝড়ের মধ্যে একটি পিতার সদ্যোজাত সন্তানসহ অসহায় যাত্রা না দেখিয়ে, বসুদেবরূপ বিশেষ লোকের কাহিনীটি চিত্রিত করেছেন। এই কাহিনী ঘিরে বহুকাল থেকে আমাদের মনে যে সেন্টিমেণ্ট আছে সেটিও এ ছবি দেখলে জেগে ওঠে। শিল্পী এই সেন্টিমেণ্টের সুযোগ নিয়ে যা আঁকতেন তাইতেই হয় তো আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেন নি। তিনি ছবির যে নিজস্ব মূল্য (যা কাহিনী মূল্যের বাইরে) তা কিছুমাত্র কমান নি। অর্থাৎ জন্মাষ্টমীর কাহিনী যিনি জানেন না তাঁর কাছেও এ ছবির মূল্য কিছুমাত্র কম নয়। বসুদেবের দেহের ভঙ্গিতে, চোখের চাহনিতে ঊর্ধ্বমুখীন অপার্থিব দৃষ্টিতে একটি নারীর নির্বাক প্রার্থনায় কি শিল্পী তাঁর নিজের অনুভূতি এ ছবিতে সার্থকভাবে প্রকাশ করেন নি? এখানে যদি মূর্তিগুলি পরিচিত মানুষের বাস্তব অনুকরণ হত তা হলে শিল্পী তাঁর কল্পনা রূপায়িত করতে অবশ্যই বাধা পেতেন। বিভিন্ন ভঙ্গিতে অঙ্কনপটু শিল্পী তাঁর এই বিশেষ ভাবটি প্রকাশ করার জন্য এই বিশেষ ফর্মটিই এখানে সবচেয়ে উপযুক্ত মনে করেছেন।

র‍্যাফেল মাতৃভাব ফোটাতে ম্যাডোনাকে তার পরিবেশ সমেত স্বাভাবিক মানুষ

ক'রে গড়েছেন, যামিনী রায় মাতৃভাব ফোটাতে তাঁর মাতৃ-মূর্তিতে মাত্র গোটাকতক রেখা ব্যবহার করেছেন। র‍্যাফেলের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত একটি সেন্টিমেণ্ট আছে - রোম্যান ক্যাথলিক সেন্টিমেণ্ট। যেখানে মাতৃস্নেহের কোমল ভাবটি ফোটানোই উদ্দেশ্য, সেখানে সেই বিশেষ ভাবটির বাহন হিসাবে স্থান ও কালের অতীত ন্যূনতম রেখা বা বর্ণই অধিকতর উপযোগী একথা বলা বাহুল্য। মাতৃস্নেহ একটি অ্যাবস্ট্রাক্ট ভাব কিন্তু ভাব অ্যাবস্ট্রাক্ট হলেও অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট হওয়া সম্ভব কিনা সন্দেহ আছে। যামিনী রায় অ্যাবস্ট্রাক্টের দরজার বাইরে বসে আছেন, সুতরাং চিত্র শিল্পের সীমানার মধ্যে আছেন। তিনি যদি ঐ প্রান্ত থেকে পুনরায় পিছিয়ে আসতে থাকেন, তা হলে তাঁর মাতৃস্নেহ আর শুধু মাতৃস্নেহ থাকবে না, তখন ক্রমশই তা রাম শ্যাম, যদু মধুর মায়ের স্নেহরূপে দেখা দেবে। কিন্তু আর্টের সীমা পার না হলে তাতেই বা আপত্তি কি? সে নির্ভর করবে শিল্পীর রুচির উপর।

আরও একটি ছবির কথা আলোচনা করা যাক। রুশ শিল্পী লাকটিওনফের 'এ লেটার ফ্রম দি ফ্রণ্ট' ছবিখানি প্রদর্শনীতে অনেকেই দেখেছেন। এখানে চিঠিখানা অবাস্তব, জনতাও অবাস্তব, কিন্তু এ-সবই শিল্পীর সূর্যালোকের বাণী ফুটিয়ে তোলার অপরিহার্য সহায়করূপে ছবির ক্ষেত্রে স্থান পেয়েছে। সূর্যের আলো শিল্পীকে আবেগ চঞ্চল করেছে, তাঁর মন ভাস্বর হয়ে উঠেছে, আলোর প্লাবনে যেন তিনি ডুবে গেছেন। আলোর এই রূপ তিনি তাঁর ছবির ভিতর দিয়ে দেখতে চেয়েছেন। যুদ্ধ-সীমান্তের চিঠি-পাঠরত একটি মানুষকে ঘিরে যে ক'জন মানুষ জড়ো হয়েছে, তার জন্য এত আলো কি দরকার ছিল? এমন আলো কি দরকার ছিল? সীমান্ত পত্র পাঠটাই এ ছবির প্রধান বাণী নয়, প্রধান বাণী হচ্ছে আলোর।

এই আলোর বাণী প্রকাশিত হতে দেখেছি অতুল বসুর একখানি ছবিতে, সেখানেও মানুষের মূর্তিকে ছাপিয়ে উঠেছে সূর্যালোকের মাধুরী। এই দুটি ছবিতেই আলো সূর্যের আলোর রেপ্রেজেণ্টেশন নয়। দেখবার সময় মনেও আসেনি যে সূর্যালোকের ফোটোগ্রাফ দেখছি। জন্ম-জন্ম সাধনা করলেও ক্যামেরা আলোর এ বাণী ধরতে পারবে না। আলো যে আবেগ জাগিয়েছিল শিল্পীর মনে তা ফোটাবার জন্য পরিবেশে মানুষের স্বাভাবিক চেহারা অপরিহার্য নয় অবশ্যই, কিন্তু স্বাভাবিক চেহারা থাকাতেই বা কি ক্ষতি হয়েছে? সেই মূর্তি-গুলো তো ছবির মর্মবাণী নয়। মর্মবাণী তাদের অতিক্রম ক'রে আলোর মতোই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তাই সকল ক্ষেত্রে একমাত্র ভঙ্গির প্রশ্নই বড় ক'রে দেখতে গেলে শিল্প-বিচারে অকারণ জটিলতা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। শিল্পীকে

ভুলে, তাঁর ব্যক্তিত্বকে বাণীকে ভুলে, এইভাবে শুধু টেকনিক ইত্যাদি নিযে বিচার করলে শিল্প উপভোগে বাধা পড়ে। পবিবেশে পরিচিত বিষয়বস্তু বেখেও যিনি আলোব মর্মবাণী ফোটাতে পাবেন, তাঁকে আমরা বড় শিল্পী বলব না কেন? আবাব যিনি পরিচিত মূর্তিব উপব নিজের ফর্ম আরোপ ক'বে বাস্তব মূর্তিকে পবিবর্তন ক'বে, ঐ একই আলোর মর্মবাণী সার্থকভাবে ফোটাবেন, তাঁকেও আমবা বড শিল্পী বলে মানব। তু'জনেব ছবি পৃথক হবে কিন্তু ছবিব উদ্দেশ্য এক হতে বাধা কি? ক্রিস্টিযান ধর্ম প্রচাবের জন্য বড় শিল্প গডে উঠেছিল ইউরোপে। তাতে বাস্তবধর্মিতাও ছিল বাণীও ছিল। আজও তা বড় আর্ট বলে স্বীকৃত। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচাবেব জন্য ভারতবর্ষে যে আর্টের সৃষ্টি হযেছিল তা সর্বত্র বাস্তবধর্মী ছিল না, কিন্তু তাতে শিল্পীর কল্পনা প্রকাশে বাধা হয নি। যুগ-সমস্যা বা যুগ-মনোভাবেব সঙ্গেও অনেক সময শিল্পেব রূপান্তর ঘটে। দেশ-ভেদেও ঘটে একথা একবার বলা হযেছে। হয তো সকল দেশে ঘটে না। আমাদেব দেশে রূপান্তব ঘটানো ইউবোপেব চেযে বেশি কঠিন। যিনি রূপান্তব ঘটাতে যাবেন তাঁব কিছু বিপদ আছে। তাই আমাদের দেশে প্রাচীন ভঙ্গিতে ছবি বচনা কবলে স্বদেশী ভঙ্গি বলে আদৃত হয, কিন্তু ইউরোপেব চিত্র-শিল্পে আধুনিক কালে কেউ প্রাচীনপন্থী হলে আমবা প্রায ধৈর্যহাবা হই। পবিবর্তনটা ওদেব বেলায চাই-ই, আমাদেব চাই না। আমাদেব চিন্তাধাবায এই জাতীয সব জট পাকিযে গেছে। যেন শিল্পক্ষেত্রে সৌন্দর্যতত্ত্ব এবং শিল্পেব মান আমাদেব এমনই অধিগত যে এখন ইউবোপীয শিল্পে দা ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো, বেমব্রাণ্ট প্রভৃতি আব আমাদেব আনন্দ দেয় না। মনে হয় যেন এক একটি যুগেব উপব এক একটা লেবেল মেবে আমবা সে সম্পর্কে শেষ কথা জেনে ফেলেছি। শিল্পেব ইতিহাস আলোচনায লেবেল মাবা চলে, কিন্তু মান-নির্ণযে শেষ কথাটি বলা চলে না, বলা উচিতও নয়। বলা মানে একপ্রকাব ইনটেলেকচুযাল স্নবারির পরিচয দেওযা। মনে পড়ে 'ইনোসেণ্ট্‌স্ অ্যাব্রড'-এর নাযকরূপী মার্ক টোযেনেব কথা। ভেনিসে গিযে শিল্প উপভোগে তিনি কি বাধাই না পেয়েছিলেন নিগ্রো ক্রীতদাসরূপ মন্ত্র-আওড়ানো গাইডেব পাল্লায পড়ে। যখনই তাঁর মনে হযেছে এইবার অবশ্যই তিনি একখানা উপভোগ্য ছবি আবিষ্কার কবেছেন তখনই তাঁব গাইড বলে উঠেছে "It's nothing—it's of the Renaissance," রেনেসাঁস কি তা তিনি জানতেন না। তাই বার বাব এইভাবে নিরুৎসাহিত হযে অবশেষে বলে উঠলেন—কে এই রেনেসাঁস? কোত্থেকে

এসেছে ? কে তাকে এ রাজ্যের সর্বত্র এত বাজে ছবি দিয়ে ভর্তি করতে অনুমতি দিয়েছে ?

পরে অবশ্য তিনি বুঝতে পারেন রেনেসাঁস কোনো ব্যক্তি নয়, আর্টের নবজীবন লাভের ও একটা 'অপচেষ্টা' মাত্র। এই নিগ্রো গাইডকে মার্ক টোয়েন এঁকেছেন বুলি-আওড়ানো সমালোচকের প্রতীকরূপে, তাই এ কথা বোধহয় নির্ভয়ে বলা চলে যে, সমালোচকের বিচিত্র মতবাদে জড়িয়ে না পড়ে সকল বড় আর্টের মধ্যেই যে সৌন্দর্য আছে তা উপভোগ করার চেষ্টা করলে বোধহয় বেশি উপকার হয়।

মহাভারতের বিশাল পটভূমিতে অতগুলো চরিত্র সৃষ্টি ক'রে কবি মূলতঃ যা বলতে চেয়েছেন তা হয় তো একটি ছোট কবিতায় বলা যায়। তা হলে আমরা মহাভারতকে মহাভার রূপে পরিত্যাগ ক'রে একটিমাত্র কবিতাকেই মহাভারতের চেয়ে বড় বলে মানতে পারি। কিন্তু তবু তা করি না। মহাভারতের ফর্মকেও আমরা আর্ট বলে স্বীকার করি বলেই তা করি না। ছোট কবিতাকেও অস্বীকার করি না। শিল্পীর প্রয়োজনগত দুটি ফর্মই সাহিত্য বিচারে সত্য বলে মানা হয়, তুলনা করার প্রয়োজন হয় না। বলি না যে, মহাভারতের কবি অতগুলো বাস্তব চরিত্রের অকারণ দাসত্ব করেছেন। দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তিনি অনায়াসে নিজের বক্তব্য বলতে পারতেন একটি গীতি-কাব্যের ভিতর দিয়ে। দুইয়ের প্রয়োজন ভিন্ন। নিজ নিজ প্রয়োজনের দাবীতে দুই-ই সত্য। দুটি ফর্মই শিল্পীর আধার হতে পারে। প্রাচীন বলেই একটি পরিত্যাজ্য নয়। আধুনিক কবিতা সম্পর্কে আধুনিক কবি সেসিল ডে লিউইস এই ধরণের কথাই বলেছেন: But remember that, where poetry is concerned, being up-to-date is not at all important. A poem will not survive unless, it is good in itself . much of the best poetry of our century...may already seem, to people of your generation, old-fashioned. Well Shakespeare seemed old fashioned, to a number of eighteenth-century critics. That was their mistake, and their loss."

সব আর্টেরই মূল উদ্দেশ্য এক, সে জন্য সাহিত্যক্ষেত্রের তুলনা চিত্রশিল্প সম্পর্কে অনেক পরিমাণে সত্য হতে বাধ্য। সাহিত্যের সঙ্গে চিত্রশিল্পের পার্থক্য এই যে, সাহিত্য-পাঠকের সঙ্গে সাহিত্য-শিল্পীর যোগাযোগ কথায় গড়া বর্ণনার মাধ্যমে,

চিত্র-দর্শকের সঙ্গে চিত্র-শিল্পীর যোগাযোগ শুধু চোখে দেখে। রূপকে প্রত্যক্ষ দর্শন ক'বে। প্রত্যক্ষ দর্শনে চক্ষুষ্মান প্রত্যেকেরই অধিকার (বই পড়ায় নিবক্ষরের অধিকাব থাকে না) সেজন্য চিত্র-শিল্প সম্পর্কে যত আলোচনা হয়, সাহিত্য সম্পর্কে বোধ হয় তত আলোচনা হয় না, সাহিত্য আলোচনা অন্তত নিরক্ষরদের মধ্যে হয না। সেই জন্যই বোধ হয বিরক্ত হয়ে পিকাসো বলেছিলেন, "প্রত্যেকেই ছবি বুঝতে চেষ্টা করে। তারা পাখীর গান বুঝতে চেষ্টা কবে না কেন? কেন তারা রাত্রির অন্ধকার, ফুল বা চারদিকের সব জিনিসকে না বুঝেও শুধু ভালবেসে তৃপ্তি পায? ছবি যেন তাদের বুঝতেই হবে।"

এটা নিঃসন্দেহে বিরক্তিব কথা। তবে তাঁব একটি কথা অত্যন্ত সত্য মনে হয়ঃ "যাঁবা ছবি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা কবেন, তাঁবা অধিকাংশ সময়েই ভুল পথে চলেন।"

এ কথার অর্থ এই যে, কোনো বড় আর্টেরই ঠিক ব্যাখ্যা চলে না। কারণ, শিল্পী তাঁর সৃষ্টির ভিতর দিয়ে যা বলতে চান, তা কখনই সম্পূর্ণ বলা হয না। তিনি যা অনুভব করেন দর্শক তাব অংশবিশেষ মাত্র বুঝতে পাবেন। শিল্পীর অনুভূতিব সঙ্গে দর্শকের অনুভূতি কখনো সম্পূর্ণ এক হতে পারে না।

এই কথাগুলি বলা দরকাব মনে হল এই জন্য যে চিত্র-শিল্প সম্পর্কে পরস্পব-বিরোধী অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে আমরা যাবা ছবি উপভোগ কবতে চাই তারা বাধা পাই। যেখানে ভাল লাগছে সেখানে শুনি ভাল লাগা উচিত নয, মার্ক টোয়েনের সেই নিগ্রো গাইডের সতর্কবাণী ধ্বনিত হয়। তাই সব সময ছবি ব্যাখ্যার চেষ্টা না ক'রে তাব সৌন্দর্য উপভোগ করাব চেষ্টা করা যে অধিকতর নিবাপদ এবং লাভজনক তা বলা বাহুল্য, অন্তত আমাদের মতো দর্শকের পক্ষে। যিনি এক কথায় সমালোচনা ক'রে সব উড়িয়ে দিতে চান, তাঁর সম্পর্কে কেলেট বলেছেনঃ—

…"he can never say the last word .. And when the last word is said, it is not decisive and may not be better than the first .. and every sentence of the critic should be preluded with a mental 'subject to revision."

ভূমিকা স্বভাবতই বড় হয়ে গেল, কিন্তু তবু এই ভূমিকার পথেই রবীন্দ্র শিল্পে পৌঁছানো আমার পক্ষে সুবিধাজনক মনে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমে বিশুদ্ধ কর্মে আকৃষ্ট হন। রেখা টানতে টানতে একটা

কিছু হয়ে ওঠাই তাঁর আনন্দের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। যে অর্থহীন এলোমেলো রেখা তাঁর চোখকে পীড়িত করছিল—তার সঙ্গে আরও কতকগুলো রেখা জুড়ে দিলেই তা যে চোখের পক্ষে তৃপ্তিদায়ক একটা চেহারা পায় এবং আরও কিছু যোগ করা মাত্র তা ভেঙে যায়, এর মধ্যে দিয়ে তিনি একটি বড় সত্য দেখতে পান। দেখতে পান এতে প্রকৃতির সৃষ্টির রীতিরই ছায়াপাত হয়েছে। প্রকৃতিতে অবিরাম যে ভাঙা গড়ার কাজ চলছে, এক রূপ ভেঙে আর এক রূপ ফুটে উঠছে এটাও তারই প্রতিচ্ছবি। এই আবিষ্কারের ফলে তাঁর মনে এক অদ্ভুত আনন্দ জাগল। কল্পনা ও অনুভূতির পথে তিনি এ সত্য কবি-জীবনের গোড়াতেই উপলব্ধি করেছিলেন—ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা—কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ দেখলেন, রূপ হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা কি ক'রে হয়। এর পর থেকে তিনি এই রূপ গড়া আর রূপ ভাঙা এবং আবার রূপ গড়ার আনন্দে মেতে উঠলেন। এতে তিনি বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে আবার নতুন পথে আত্মীয়তা অনুভব করলেন। তাঁর মনে অভূতপূর্ব এক আনন্দ জেগে উঠল। এই আনন্দের বাণী আছে তাঁর চিত্র শিল্পে। তিনি নিজে বলেছেন: যেমন আমার ছবি আঁকা তেমনি আমার চিঠি লেখা। একটা যা হয় কিছু মাথায় আসে লিখে ফেলি, প্রতিদিনের জীবন-যাত্রায় ছোট-বড়ো যে সব খবর জেগে ওঠে তার সঙ্গে কোনো যোগ নেই। আমার ছবিও ঐ রকম। যা হয় কোনো একটা রূপ মনের মধ্যে হঠাৎ দেখতে পাই, চারদিকের কোনো-কিছুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য বা সংলগ্নতা থাক বা না থাক আমাদের ভিতরের দিকে সর্বদা একটা ভাঙা গড়া চলা-ফেরা, জোড়া-তাড়া চলছেই, কিছু বা ভাব, কিছু বা ছবি নানারকম চেহারা ধরছে—তারই সঙ্গে আমার কলমের কারবার। এর আগে আমার মন আকাশে কান পেতে ছিল, বাতাস থেকে সুর আসত, কথা শুনতে পেত, আজকাল সে আছে চোখ মেলে রূপের রাজ্যে, রেখার ভিড়ের মধ্যে। গাছপালার দিকে তাকাই, তাদের অত্যন্ত দেখতে পাই—স্পষ্ট বুঝতে পারি জগৎটা আকারের মহাযাত্রা। আমার কলমেও আসতে চায় সেই আকারের লীলা। আবেগ নয়, চিন্তা নয় রূপের সমাবেশ। আশ্চর্য এই যে তাতে গভীর আনন্দ। তার রহস্যের অন্ত নেই।"

এই আনন্দ, এই রহস্যের বাণী বহন করছে রবীন্দ্র-শিল্প। যা ছিল শুধুই আকার, তার মধ্যে ফুটে উঠল শিল্পীর আনন্দ ও রহস্যের অনুভূতি, আর সেই মুহূর্তেই তাঁর রেখারূপ ও বর্ণরূপ আর্টের ক্ষেত্রে মাথা তুলে দাঁড়াল। তার

কারণ এই যে সম্পূর্ণ অচেতন মন আর্ট সৃষ্টি করে না। আকস্মিকভাবে চেতন মনের বাইরে বিশ্ব-প্রকৃতিতে যে রূপ প্রতিনিয়ত প্রকাশিত তা আর্ট নয়। (এরিক নিউটন বলেন আর্ট মানুষের রচিত হওয়া চাই-ই।) অজ্ঞান শিশু যে হিজি-বিজি লাইন কাটে, তা দৈবাৎ যদি ছবি হয়েও ওঠে তবু তা আর্ট নয়। আর্ট হতে হলে তার পশ্চাতে সচেতন মন থাকা চাই। এই চেতনার তারতম্য থাকতে পারে বিশেষ ক্ষেত্রে, সৃষ্টির কোনো মুহূর্তে সাময়িকভাবে চেতনা আচ্ছন্নও থাকতে পারে এবং থাকাই স্বাভাবিক, কিন্তু তা অচেতনতা নয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর আর্টকে বুঝতে গিয়েও ব্যর্থ হয়েছেন. কিম্বা বুদ্ধি দিয়ে বোঝার চেষ্টাকে অগ্রাহ্য করেছেন, তিনি তাঁর আর্ট সৃষ্টির ইতিহাস বিবৃত করার চেষ্টা করেছেন মাত্র। তিনি যে প্রকৃত প্রেরণাপ্রাপ্ত শিল্পীজনোচিত কাজই করেছেন, এ সত্যটিও হয়তো তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি, কিম্বা পারলেও সম্ভবত বিনয় বা দ্বিধাবশত গোপন ক'রে গেছেন। তিনি তাঁর ছবি সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছেন বিনয়বশত, কিন্তু তা নির্ভরযোগ্য নয়। স্রষ্টা নিজে তাঁর সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করতে পারবেন এমন কোনো কথা নেই। বরঞ্চ অধিকাংশ সময়েই যে পারেন না এটি একটি সত্য কথা এবং এ সত্য বোধ হয় প্রথম আবিষ্কার করেন সক্রেটিস।

উপরে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি যেটুকু উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেটি তাঁর সৃষ্টির ইতিহাস, ব্যাখ্যা নয়। ঠিক এই জাতীয় ইতিহাস পাই পিকাসোর আর্টের, পিকাসোর নিজের কথায়। তিনি বলেছেন :

"I see for others, that is to say, so that I can put on canvas the sudden apparitions which force themselves on me, I don't know in advance what I am going to put on the canvas, anymore than I decide in advance what colours to use...Everytime I begin a picture, I feel as though I were throwing myself into the void, I never know if I shall fall on my feet again. It is only later that I begin to evaluate more exactly the result of my work."

আমাদের দেশের জনৈক প্রবীণ সমালোচক বলেছেন :

'..in moments of subjective trance, when his adult personality takes rest, to make room for his child personality to

romp and play." এঁর সঙ্গে একমত হওয়া কঠিন। হয় তো আর্টে যাকে ক্রাফ্‌টসম্যানশিপ বলে রবীন্দ্র শিল্পে তার ব্যতিক্রম ঘটায় তাঁর একথা মনে হয়েছে। কিন্তু তা হলে তো সবটাই শিশুজনোচিত খেলা বলে উড়িয়ে দিতে হয়। তবে কথাটা যদি তিনি এই অর্থে বলে থাকেন যে সমস্ত প্রেরিত বা ইন্সপায়ার্ড আর্টেরই মূলে আছে শিশুর মতো পবিত্র মন তা হলে কথাটা সত্য এবং তা হলে রবীন্দ্র নাথের চিত্র নয় তাঁর যাবতীয় প্রেরিত কাব্য সম্পর্কেই একথা সত্য এবং শুধু তাঁর নয় জগতের সকল সমজাতীয় আর্ট সম্পর্কেই তা সত্য। কিন্তু সকলের ক্ষেত্রে আমরা চাইল্ড পারসোন্যালিটির কথা বলি কি? বলি না কারণ ঐ কথাটির মধ্যে কিছু পরিমাণ কৃপার ভাব আছে। ভাষার ক্রাফট কবির আবাল্য সাধিত বস্তু, তাই সেখানে চাইল্ড পারসোন্যালিটির প্রশ্ন হয় তো ওঠেনি। চিত্র-শিল্পের ক্রাফটস্‌-ম্যানশিপ কবির আয়ত্ত নয় একথা সত্য। কিন্তু তিনি চেষ্টা করলে অল্পদিনেই তা আয়ত্ত করতে পারতেন একথা জোর করেই বলা যায়। সেটি যে কোনো আগ্রহশীল শিক্ষার্থীর পক্ষে দুঃসাধ্য কাজ নয়। বরঞ্চ (হারবার্ট রীডের মতে) শিল্পীযশঃপ্রার্থীর পক্ষে ক্রাফটস্‌ম্যানশিপের আড়ালে অক্ষমতা লুকিয়ে রাখা বেশি সহজ। আসল কথা রবীন্দ্রনাথের এই ক্রাফ্‌টম্যানশিপের প্রয়োজনই হয়নি।

তা ভিন্ন শিশুজনোচিত বা শিশুব্যক্তিত্ব বলায় বিপদও আছে। ধরা যাক্‌, রবীন্দ্রনাথের নাম গোপন রেখে শুধু তাঁর ছবিগুলো দেখা হচ্ছে ছোটদের ছবির সঙ্গে মিশ্রিত ক'রে। এমন অবস্থায় কি রবীন্দ্রশিল্পের বৈশিষ্ট্য কিছুই থাকবে না? তাই যদি হবে তা হলে মুকুল দে যে বলেছেন, "...an entirely new departure in representing the reality with his own vigorous master-strokes which knows no faltering" এ কথাটা সমর্থন করা যায় কেমন ক'রে? এই সঙ্গে আরও দু'একটা মতবিচার করা যাক: "বার্মিংহাম মেল"-এ কেইন্‌স্‌ স্মিথ বলেছেন,

"...marvellous example of the sense of balance and harmony...."

যোসেফ সাউদল:

"...the work of a powerful imagination seeing things in line and colour as the best Oriental sees them...."

"ফোসিশে ৎসাইটুং':

The way Tagore coloured these ..displays educated sensitive taste of oldest culture."

এ সবই তো পরিপক্ক শিল্পীব উদ্দেশে বলা। চাইল্ড পারসোন্যালিটির প্রশ্নই ওঠে না। রবীন্দ্রনাথ যে ভঙ্গির আশ্রয নিয়েছেন তা তাঁব নিজের পাওয়া ভঙ্গি। ইউরোপেও অনেক শিল্পী নিজ নিজ স্বাধীনপথে পবীক্ষা চালাচ্ছেন। এ স্বাধীনতা শিল্পীর আছে। তাঁদের ছবি বাস্তবধর্মী নয়—কিন্তু তাতে পবিচিত বাস্তব জিনিসের আভাস আছে। (একেবারে অপরিচিত ফর্ম-মাধ্যমে অ্যাবস্ট্র্যাক আর্টের পরীক্ষাও আছে।) কিন্তু আর্টে পরিচিত জিনিসের দূর আভাস অন্তত থাকা চাইই। তাঁরা কেউই মানুষ বা গাছ দেখতে কেমন তা এঁকে দেখানোর চেষ্টা করেননি। আর্টের লক্ষ্যই তা নয়। এই লক্ষ্য সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায সাধারণ দর্শকের পক্ষে আর্ট উপভোগে বাধা হয়। তারা মনে করে ওটাও অক্ষমতা। যেমন বাস্তবঘেঁষা ফর্ম দেখলেই আর এক শ্রেণীর দর্শক বলেন ওটাও অক্ষমতা। এই শেষোক্তেরা লেবেল-আসক্ত। আর্টের ইতিহাস জেনে কোন্ রীতি আগে কোন্ রীতি পরে জন্মলাভ করেছে সে সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা কঠিন নয়, কিন্তু শুধু এই পারম্পর্য জ্ঞানই আর্টের উৎকর্ষ অপকর্ষ প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। স্পষ্ট হবে আশা করেই আমার এই আলোচনা।

এই আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হল। সব কথা সম্পূর্ণ বলা হল না। যেটুকু বলা হল তার ফাঁকে অনেক কথাই উহ্য থেকে গেল এবং খুব বিস্তৃত ক'রে বললেও যে বক্তব্য খুব সরল হত তা বলা যায় না এবং সবাই এই অনধিকারীর কথা মানবেন এমন বিশ্বাস করি না। না মানাব পথ উন্মুক্ত আছে। কারণ, আমি অ্যাকাডেমিক আলোচনায অক্ষম। তবে ভরসা এই যে, ছবির ক্ষেত্রে যাঁবা অ্যাকাডেমিক রীতি দেখলেই দুঃখ পান, আমাব এই আলোচনায তার অভাব দেখলে তাঁরা হয়তো দুঃখ নাও পেতে পারেন। অতএব তাঁদের উদ্দেশে কেলেটের একটি মূল্যবান কথা উদ্ধৃত ক'রে এ বচনা শেষ করি :

"The moral for the critic is obvious. He must deal less freely than is his wont in triumphant certainties and "absolute shalls." He must work out his declamations with fear and trembling, and ridicule must be tempered with selflove : for he can never be certain that he himself may not, in the long run, turn out to be the ridiculous party."

(১৯৫২)

আমার দেখা শিশিরকুমার ভাদুড়ি

শিশিরকুমাব ভাদুড়ি সম্পর্কে আমার 'ইম্প্রেশন' লিখতে অনুরোধ এসেছে পূজা সংখ্যা দৈনিক বসুমতী সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটকের কাছ থেকে।

কোনো জীবিত ব্যক্তি—বিশেষ ক'বে যাঁর সঙ্গে স্নেহ প্রীতির সম্পর্ক—তাঁর বিষয়ে কিছু লেখায় সঙ্কোচ হয। কারণ শ্রদ্ধা, প্রীতি বা স্নেহ মানুষের দৃষ্টিকে কিছু পরিমাণ অন্ধ কবে এ বকম একটি কথা প্রচলিত আছে সমাজে এবং কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হওয়া দবকার, এমন কথাও বলেন অনেকে।

কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ সত্য বলে আমি মনে করি না। যে নিরপেক্ষতা নাইট্রিক অ্যাসিড সম্পর্কে আশা করা চলতে পাবে, মানুষেব সম্পর্কে তা চলে না বলেই মনে হয। এক অ্যাটম হাইড্রোজেন, এক অ্যাটম নাইট্রোজেন ও তিন অ্যাটম অক্সিজেনেব যৌগিক মিলনে নাইট্রিক অ্যাসিড হয একথা প্রকাশ কবলে কেউ অভিযোগ কববে না যে, পক্ষপাতিত্ববশত আমি নাইট্রিক অ্যাসিডে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছি। অথবা বাড়িয়ে দেখছি।

কিন্তু কোনো বিশেষ মানুষেব প্রতি আমাদেব অভিগম বা 'অ্যাপ্রোচ' নাইট্রিক আসিড থেকে পৃথক। কবি বা শিল্পী-মানুষকে জানতে হলে তাঁদেব জীবনেব সঙ্গে কাব্য বা শিল্পেব সম্পর্ক আবিষ্কাবই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। শুধুই মানুষটি সম্পর্কে বলতে হলে কিছু দূব কালে যেতে হবে।

ববীন্দ্রনাথ তাঁব জীবন-স্মৃতিতে কবি-ববীন্দ্রনাথকে দেখবাব চেষ্টা কবেছিলেন। আঁদ্রে মোবোয়া মানুষ-শেলীকে দেখবাব চেষ্টা করেছেন তাঁব শেলীব জীবনীতে। কি সংবেদন, অনুকম্পা ও 'পক্ষপাতিত্ব'। যন্ত্রেব বিচাবে যে শেলীকে ক্রিমিন্যাল বলা চলত, শ্রদ্ধা ও প্রীতির বিচাবে তা সবই কবিব বৈশিষ্ট্যরূপে ফুটে উঠেছে। মানুষ-ভ্যান গগকে দেখেছেন আবভিন স্টোন। সে বই পড়লে শিল্পীব সমস্ত ক্রটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও তাঁব প্রতি আমাদের অসীম করুণা প্রীতি ও শ্রদ্ধা জাগে না কি?

অতএব কবি বা শিল্পীর প্রতি এই মানবীয় অভিগমই স্বাভাবিক। দূব কালের পরিপ্রেক্ষিতে না দেখলে এঁদেব মানুষরূপে বিচার করার যোগ্যতাই লাভ হয না। কারণ, সমকালের ব্যক্তিকে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের

স্বার্থের সম্পর্কে দেখি। স্বার্থের সম্পর্ক যদি না থাকে, যদি শ্রদ্ধা ও প্রীতি থাকে, তবে সেই শ্রদ্ধা ও প্রীতির চোখে দেখতে পারলে বিচারের অনেকখানি অধিকার পাওয়া যায়। এই অধিকার পেয়েছিলেন বস্‌ওয়েল—জনসনের সম্পর্কে।

অতএব যাঁরা বলেন মানুষ সম্পর্কে কিছু বলতে হলেই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হওয়া উচিত, তাঁরা জড়-পদার্থের সঙ্গে মানুষকে এক ক'রে দেখেন। তাঁদের মতে নিরপেক্ষ হওয়া মানে হয়তো এই যে, মানুষের গুণের সঙ্গে কিছু দোষও উদ্‌ঘাটন করা চাই। কিন্তু তা হলেই কি 'নিরপেক্ষ' বিচার হয়? মানুষ দূরের কথা, মানুষের ইতিহাস আজ পর্যন্ত নিরপেক্ষ লেখা সম্ভব হয়েছে? হয়নি—কারণ তা অসাধ্য। আর অসাধ্য বলেই নিরপেক্ষ হবার চেষ্টার মধ্যে অনেক সময়েই একটা আত্ম-প্রতারণার ভাব থেকে যায়। অতএব এ চেষ্টার মধ্যে একটা অন্যায় আছে। তার মানে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিচারে "নিরপেক্ষ" শব্দটাই অচল।

এতটা ভূমিকা হয় তো দরকার ছিল না, কারণ শিশিরকুমার সম্পর্কে আমার দায়িত্বের বোঝা আরও হাল্কা ক'রে দিয়েছেন শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক। আমাকে জীবনী লিখতে বলেন নি, বলেছেন আমার ইম্প্রেশন লিখতে, অর্থাৎ আমি যে চোখে শিশিরকুমারকে দেখেছি। আমার এই ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তর্কের অবসর নেই, অতএব আমি নিরাপদ।

শিশিরকুমারের বিষয়ে সার কথা হচ্ছে তিনি শিক্ষক, কলেজেও শিক্ষক ছিলেন স্টেজেও শিক্ষক আছেন অদ্যাবধি। তাঁর প্রতিভা দুই ভাগে বিভক্ত—এক ভাগ শিক্ষক, অন্য ভাগ শিল্পী। যেখানে তিনি শিল্পী সেখানে তিনি নিজেরই পরিকল্পিত নাট্যরূপের প্রধান অঙ্গ। এই ক্ষেত্রে তাঁকে আর পাঁচ জনের সঙ্গে মিলে একটি অখণ্ড রূপ ফুটিয়ে তুলতে হবে। আর পাঁচ জন যদি না জোটে, তা হলে শিল্পী শিশিরকুমারের সার্থকতা নেই। কিন্তু শিক্ষক শিশিরকুমারের সার্থকতা থাকবে স্টেজ থেকে অবসর গ্রহণ করলেও।

শিল্পী শিশিরকুমারেরও দুটি দিক আছে, এক দিকে তাঁর প্রয়োগকুশলতা, যা তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং মৌলিক এবং আর এক দিকে তিনি তাঁর পরিকল্পিত নাটকের নায়ক। এই নাট্য পরিকল্পনা চিত্র-পরিকল্পনার সঙ্গে মেলে। ক্যানভাসে ছবি আঁকার বেলায় শিল্পী যতখানি ক্ষেত্র পান তার সমস্ত অংশে সমান মনোযোগ দিতে হয়। ছবির প্রধানকে ফোটাতে তুচ্ছতম আলোছায়া বা বস্তুবিন্যাসে একান্ত মনোযোগ না থাকলে ছবি ব্যর্থ হয়। শিল্পী প্রধান দর্শনীয়ের স্বার্থেই

অপ্রধানের দিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হন। অর্থাৎ তাঁর সমগ্র চিত্র-পরিকল্পনায় কোনো অংশই অবহেলিত থাকবার উপায় নেই।

শিল্পী শিশিরকুমার এই শিল্পধর্ম অনুসরণ করেছিলেন বলেই তাঁর প্রযোগাধীনের নাটক এমন অভিনবত্বের স্বাদ বয়ে এনেছিল। সীতা নাটকের পরিকল্পনায এই অভিনবত্ব প্রথম দেখা যায়। এ দেখে বাঙালী দর্শক সে সময় উন্মাদ হয়েছিল। সাধাবণ বাঙালী অবশ্য যে-কোনো ব্যাপারে চট ক'বে উন্মাদ হয়, কিন্তু শিশিব-কুমারের অভিনয়-কৌশল ও প্রয়োগ-কৌশলে এমন কিছু অসাধারণত্ব ছিল, যাতে সমস্ত বাঙালীব ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ভালবাসা তাঁর প্রতি উচ্ছলিত হয়ে উঠেছিল। এ উন্মাদনা অন্তবেব শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদনেব উন্মাদনা। এমন সুন্দর চেহাবা, এমন মধুব কণ্ঠেব সঙ্গে কদাচিৎ মেলে। সীতা নাটকে রাম-উচ্চাবিত "কার কণ্ঠস্বব ?"—এই ধ্বনির মধ্যে সে দিন সমস্ত বাঙালী শিশিব-কুমাবেব কণ্ঠস্বরই শুনতে যেত থিযেটাবে। আজও যায।

কোনো নাটকেব সামগ্রিক পবিকল্পনাব সঙ্গে নিজেকে না মেলালে শিশিব-কুমাবের অভিনয কবতে কষ্ট হয। যখন পূর্ণ শক্তি ছিল তখন, ভাস্কব যেমন অপবিসীম ধৈর্যেব সঙ্গে অমূর্ত পাথব কেটে মূর্তি গড়েন তেমনি নিষ্ঠা ও উৎসাহেব সঙ্গে তিনি তাঁব মনেব মতো নতুন শিল্পী গড়ে তুলেছেন।

আমি অতীত কালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করছি; তাব কাবণ, শিশিরকুমাব যে ক'খানা নাটক মঞ্চস্থ করেছেন তাব বযস হযে গেল। আজ তাঁর নিজেব বয়স পঁয়ষট্টি পার হতে চলেছে, এবং যদিও আজও তাঁকে শৌখীন শিল্পীদেব মধ্যে বসে আগেরই মতো উদ্যমে বিহার্সাল পরিচলনা কবতে দেখছি, তবু এ কথা দুঃখেব সঙ্গে স্বীকার করতে হয যে নবাগত অভিনেতা যশঃপ্রার্থীদেব মধ্যে পূর্বের সেই নিষ্ঠা যে কাবণেই হোক, আর নেই। তাই আগেব জিনিস এখন আব সহজে গডা যায় না। হয়তো দেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তন এ জন্য দায়ী। হযতো এই জন্যই আপন গরজে, অভিনয়-শিল্পে নৈপুণ্য লাভের অদম্য বাসনা নিযে থিয়েটারে যোগ দেবার লোকের অভাব ঘটেছে। তা ভিন্ন এখন প্রযোগে কাজচলা কৌশল অবলম্বন ক'বে ব্যক্তিগত ভাবে ন্যূনতম অভিনয়-বিদ্যার (স্টেজে দাঁড়িয়ে মুখস্থ বলার বিদ্যাব) সাহায্যে এবং নাটকে নাটকীযত্বেব পরিমাণ বাড়িয়ে ব্যবসা হিসাবে সহজ সাফল্য লাভের উপায় এখনও উন্মুক্ত থাকা সম্ভব।

তার কারণ এখন দর্শকের সংখ্যা বেশি, এবং দেশী সিনেমা শস্তা উপভোগ্য

আমদানি ক'রে থিয়েটারের অভিনয় আদর্শকেও কিছু পবিমাণে নিচে নামিয়ে এনেছে। অর্থাৎ সাধাবণ দর্শকের রুচির খুব বেশি উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয় না। রুচিবান দর্শকেব সংখ্যা অবশ্য সব সব যুগেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবু গত পঁচিশ বছরে যে পবিমাণ বৃদ্ধি হওয়া উচিত ছিল, সম্ভবত তা হয়নি। তা হলে এতগুলো হলিউডের ছবি এদেশে একসঙ্গে চলতে পারত না। এই তো সেদিনও চিরকুমার সভা দেখতে পার্শ্বস্থ দর্শকের মুখে মন্তব্য শোনা গেছে "এই রে, আবার রবি ঠাকুরের গান আরম্ভ হল।"

তা ভিন্ন আধুনিক কালেব উপযোগী নতুন নাটকের দাবীও তো দেখছি না। শিশিরকুমার বলেন, অভিনয-বিদ্যার মূল তত্ত্বটি আগে হাতেকলমে আযত্ত ক'বে, অর্থাৎ এ বিষয়ে যথাবোগ্য শিক্ষালাভ ক'রে তবে অভিনয়ে নামা উচিত। নতুন নাটকেব বিষয়বস্তুতে টেকনিকে দৃষ্টিভঙ্গি হবে নতুন কিন্তু প্রয়োগ-বিদ্যা জানতে হবে আগে। অভিনয-শিল্পীদেব মার্জিত উচ্চারণ, ধ্বনিতত্ত্ব এবং অভিনয়-ভঙ্গি যথেষ্ট পরিশ্রম ক'বে আযত্ত না ক'বে অভিনযে নামার তিনি ঘোব বিবোধী। এজন্য স্কুল থাকা দরকাব। অন্য দেশেব অভিনেতাদের কত জানতে হয, রীতিমতো শিক্ষিত হতে হয। এ দেশেই বা তা না হবে কেন?

শিশিবকুমার যে নাটকে অভিনয করবেন তা সমগ্র ভাবে তাঁব নিযন্ত্রণাধীন না হলে তিনি তার মধ্যে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেন না। দেখিনি কোনো ব্যতিক্রম। যে যা খুশি পার্ট দিক, যে-ভাবে বলতে বলে বলুক, এই শর্তে বাজি হলে, আমার ধারণা তিনি সিনেমা থেকে প্রচুব টাকা আয কবতে পারতেন। কিন্তু এ কাজ তাঁর মানসিক গঠনের সঙ্গে খাপ খায় না বলে কবেননি। অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। টাকাব অভাবে তাঁর পরিকল্পিত অনেক নতুন নাটকের মনের মতো প্রযোগ তিনি কবতে পাবেননি, কিন্তু তবু নিজের ধর্ম ত্যাগ করেননি। আগেব যুগের কথা বলতে পাবি না, আধুনিক কালে অন্তত অন্যেব পরিকল্পিত সিনেমা বা নাটকে তিনি অভিনয কবতে পারেন না। বহু দুঃখ এবং আঘাতের মধ্যেও তিনি এই একটি বিষয়ে—অর্থাৎ যেখানে তিনি আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাসী শিল্পী—সেখানে তিনি টাকার লোভে নিজের আদর্শকে বিসর্জন দেননি। আধুনিক সিনেমার রূপালি প্রলোভনের মুখে দাঁড়িয়ে স্বধর্ম বজায় রাখা কম কৃতিত্বেব কথা নয। কিংবা এ'কে যদি কৃতিত্ব নাই বলি, তাতেও কিছু এসে-যায় না।

শিশিরকুমার মধুব ব্যক্তিত্বের অধিকারী। অধ্যাপকরূপে ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবহার

ছিল তাঁর অতি মধুর। সর্বদা হাসি-মুখ। কৌতুকপ্রিয়তা ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। একদিন চতুর্থ বার্ষিক ইংরেজি অনার্স ক্লাসে (ফিলোলজি) একটি ছাত্র একটি অপ্রচলিত শব্দের মানে জিজ্ঞাসা করেছিল—শিশিরকুমার তৎক্ষণাৎ মৃদু হেসে তার চোখের দিকে চেয়ে পাল্টা জিজ্ঞাসা করলেন "Do I look like a dictionary !" (আমি কি অভিধানের মতো দেখতে ?)

ছেলেটিকেই অপ্রস্তুত করলেন উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে।

ইংরেজি সাহিত্য এক কালে বেশ ভাল ভাবেই অনুশীলন করেছিলেন, এবং আজও তিনি নিয়মিত ছাত্রের মতো অধ্যবসায় নিয়ে পড়াশোনা করেন। কোন্ বইয়ের কোন্ সনে এডিশন বেরিয়েছে তাও মুখস্থ। নাট্যশাস্ত্র বিষয়ে, বিশেষ ক'রে নাট্যসমালোচনা বিষয়ে তাঁর আকর্ষণ খুব বেশি, স্বভাবতই। ইংরেজি সাময়িক পত্র অনেকগুলো নিয়মিত পড়েন এবং বইও কেনেন মাঝে মাঝে। নাট্য বিষয়ে নতুন বই বেরোলে সে বই সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহলী হয়ে ওঠেন।

অনেক দিন দুঃখ প্রকাশ করেছেন, বাংলা ভাষায় নাট্য সমালোচনার মান উঁচু হল না বলে। নাটক বিষয়ে উচ্চাঙ্গের আলোচনা তিনি এদেশের ইংরেজি-বাংলা দৈনিক কাগজে দেখতে চান, আলোচনা উচ্চ সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত দেখতে চান। বাঙালীর জীবনের সঙ্গে থিয়েটার কি ভাবে সম্পর্কিত তা লোকে ভুলে যাচ্ছে। একদিন একখানা ইংরেজি নাট্যসমালোচনার সঙ্কলন গ্রন্থ এনে আমার হাতে দিয়ে বললেন, এখানা পড়ে দেখ, আনন্দ পাবে। বইখানা ওল্টাতেই দেখি, বাংলায় আমার নামে উপহার দেওয়া। তিনি ওখানা আমার জন্য কিনে এনেছেন !

আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি নিজের সম্পর্কে তিনি কোনো প্রচার চান না। তাঁকে অভিনন্দন দেওয়া বা মানপত্র দেওয়া ইত্যাদি প্রস্তাব শুনলে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন, তাঁকে রাজি করানো কারো পক্ষেই সম্ভব হয় না। এবিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ অনমনীয়।

মনে হয় এর মধ্যে প্রবল একটা অভিমান আছে। অথবা কোনো কোনো খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তির মনে একটা নির্দিষ্ট বয়স পার হলে সকল পার্থিব বিষয়ে একটা disillusionment বা মোহমুক্তি ঘটতে থাকে। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও এটি ঘটতে পারে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে পার্থিব যশের প্রতি একটা বিরূপতা এবং ক্রমে বিদ্রোহ জেগে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের মনে এই মোহমুক্তি ঘটেছিল।

লক্ষ্য ক'রে দেখেছি—নাটক বা নাট্য সাহিত্য বিষয়ে উৎসাহী শ্রোতা পেলে আলোচনা করতে তিনি খুব ভালবাসেন।

বন্ধুবাৎসল্য অপরিসীম। ছোটখাটো ব্যাপারে মানুষের একটা দিকের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। বই পড়ার ঝোঁক—অতএব আমার লাইব্রেরি থেকেও কতবার বই নিয়েছেন এবং এখনও মাঝে মাঝে নেন। নেবার সময় নিজে থেকেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান কবে বই ফেরৎ দেবেন। যখন ইচ্ছে দেবেন বললেও তিনি নিজে একটা তারিখ দেবেন এবং ঠিক সেই তারিখে নিজ হাতে বই ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন। নিজে আসতে না পারলে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। এর কোনো ব্যতিক্রম হয় না। তাঁর কাছে গেলে উঠে আসা দুঃসাধ্য হয়, বহু প্রসঙ্গে আলোচনা শেষ হতে চায় না। তারপর বিদায় নেওয়া হয় লজ্জাকর। তিনি নিচে নেমে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছেন কতদিন। বারণ শুনতে চান না। তাঁকে কিছু দেওয়া শক্ত ব্যাপার। একটা চুরুটও নেবেন না। অফার করলে নিজের ভাণ্ডার থেকে দু'টো বের ক'রে এনে বলবেন রেখে দাও। অত্যন্ত তুচ্ছ ঘটনা, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে একটা পরিচয় কি ফুটে ওঠে না?

অ্যাকাডেমি গঠনের পর তাঁকে ফেলোশিপ দান করা নিয়ে দেখেছি উত্তেজনা। অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে শিশিরকুমারকে শিল্পীরূপে এই ভাবে স্বীকার ক'রে নেওয়ার মধ্যে আপাত-দৃষ্টিতে খুব অন্যায় আছে বলে মনে হবে না, যদিও শিশির-কুমারের প্রতিভার স্বীকৃতি এটি হতেই পারে না। এর কি দাম আছে তাঁর কাছে? কিন্তু সম্মান যে রূপেই আসুক তাতে তাঁর প্রতিক্রিয়া অতি সাংঘাতিক। ফেলোশিপ দান করা হয়েছে, তিনি কিছুই জানেন না, হঠাৎ এক চিঠি পেয়ে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। তৎক্ষণাৎ তা গা-থেকে ঝেড়ে ফেলতে না পাবলে যেন স্বস্তি নেই, যেন শুচিতা নেই। মনে মহা উত্তেজনা। অবশেষে এক চিঠি লিখে বসলেন, যার ভাবার্থ হল এই—তোমাদের এ সম্মান আমার প্রয়োজন নেই।

ভাষা বেশ রূঢ়। তাঁকে অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান-পত্র যথাসাধ্য কোমল ভাষায় লেখানো হল।

বিদেশ থেকে অন্তত দু'বার নিমন্ত্রণ এসেছিল তাঁর কাছে, কিন্তু তিনি যেতে রাজি হননি। বিদেশী সরকারের টাকায় ঘোরবার কল্পনা তাঁর ভাল লাগেনি—এই রকম বলেছিলেন আমাকে। এ কথায় অত্যুক্তি নেই, শিশির-

কুমারকে যাঁরা জানেন তাঁরা বুঝতে পারবেন দলে মিশে ঐ জাতীয় ভ্রমণ তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (মহাস্থবির) শিশিরকুমারের পুরাতন বন্ধু। প্রেমাঙ্কুরকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন গল্প জমাতে তাঁর তুল্য কেউ নেই। এই মহাস্থবির গল্প বলবার সময় সর্বাঙ্গীন ভাবে মহাজঙ্গম হয়ে ওঠেন, স্থবিরত্ব বা স্থাবরত্ব সব ঘুচে যায়। কাহিনী বলতে বলতে দাঁড়িয়ে ওঠেন এবং পায়ের নিচের মাটিকে রঙ্গমঞ্চ মনে ক'রে সমস্ত বক্তব্যটাই অভিনয়ের সাহায্যে জীবন্ত ক'রে তোলেন।

আমার ছোট ঘরখানিতে এঁদের দু'জনের প্রায় দেখা হয়ে যায় এবং দেখা হলে যে সব ঘটনা ঘটে তা টিকিট কিনে দেখবার মতো। শিশিরকুমার এবং প্রেমাঙ্কুর দুজনেই বয়স কমে প্রায় স্কুলের ছেলে হয়ে পড়েন, বহু বিচিত্র স্মৃতিকথা উদ্দাম হাস্যকৌতুকের মধ্য দিয়ে ফেটে পড়তে থাকে, সময়ের হিসাব থাকে না।

বছর দুই আগে—এই সময় নিদ্রাহীনতায় সম্ভবত বেশি ভুগতেন. খুব সকালে আসতেন, এসেই "পরিমল—শরীরটা বড় খারাপ" বলতে বলতে ঘরে প্রবেশ করতেন। বলতেন বটে, কিন্তু দু'চার মিনিটের মধ্যেই "শরীর খারাপ" কোথায় অন্তর্হিত হত। তারপর প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যেতে মাঝপথে শেক্সপীয়ারের আবির্ভাব ঘটে গেলে আবৃত্তি চলত স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে। শরীর খারাপ বলা ব্যাপারে নিরুৎসাহ করায়, এবং সম্ভবত স্বাস্থ্য ভাল হওয়ায়, এখন আর দুশ্চিন্তাটি আগের মতো নেই। গত বৎসর আমার স্ত্রী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"ভাল আছেন তো?" তিনি হেসে বেশ জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, "কেন ভাল থাকব না? খুব ভাল আছি।"

এখনও মাঝে মাঝে শরীর প্রসঙ্গ তোলেন। পরেই অবশ্য সব ভুলে যান। কিছুদিন ধরে বলে আসছেন, "মনে থাকছে না কিছু—সব ভুল হয়ে যাচ্ছে।" এই অভিযোগ তাঁর মুখে প্রায় লেগেই আছে। বোঝা যায় না কি ভুল হচ্ছে। এখনও যা মনে আছে আমাদের চেয়ে দশগুণ বেশি তো বটেই।

সাহিত্য—বিশেষ ক'রে নাট্য-সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করতে চান, যাতে আরও পড়াশোনার প্রবৃত্তি বাড়ে। কিন্তু উপযুক্ত আড্ডার অভাবে সে ইচ্ছা আর পূরণ হয় না। বহু দিন বলেছেন, রাত আটটার পরে তাঁর অবসর, সেই সময় আড্ডা জমাতে ইচ্ছা করে।

একটা বিকল্প ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া গেছে বন্ধুদের সাহায্যে। আড্ডা ঠিক নয়, অভিনয়-শিক্ষার ব্যবস্থা। সে আড্ডা তাঁর স্টেজেই বসে আসছে কিছুদিন ধরে।

যৌবন শক্তি যেন ফিরে আসে পার্ট শেখাতে গিয়ে। শিক্ষকরূপে এমন আন্তরিকতা দুর্লভ।

ভুল হওয়ার প্রসঙ্গে ফেরা যাক। তিনি একই সঙ্গে যত বিষয় মনে রাখতে পারতেন এখন স্বভাবতই তা পারেন না, পারা উচিতও নয়। সমস্ত একসঙ্গে মনে পড়ে না বলে তাঁর বড়ই দুঃখ। তবে মনোযোগ ঘনীভূত করলে এখনও সব স্মরণ করতে পারেন বলেই মনে হয়। বয়স বেশি হলে কতকগুলো বিষয় আপনা থেকেই ভুল হতে থাকে, সেটি মনের স্বাস্থ্যের পক্ষেই প্রয়োজন। তবু উৎসাহ দিই, বলি, এখনও যা মনে আছে, তার কাছে আমরা লজ্জিত।

আজ ১১ই সেপ্টেম্বর এই প্রবন্ধ লিখছি। গতকাল শিশিরকুমার এসেছিলেন আমার কাছে। যাবার সময় দরজার বাইরে গিয়ে বললেন, "লাঠি এনেছিলাম কি?" তারপর একটুখানি ভেবে নিয়ে বললেন, "না, স্পষ্ট মনে আছে, আনিনি।"

তাঁকে বিদায় দিয়ে ঘরে ফিরে এসে দেখি তাঁর লাঠিখানা আমার ঘরে পড়ে আছে। (১৯৫৪)

ধূমকেতুর উদ্দেশে খোলা চিঠি

অপরিচিতেষু, তুমি কোথা হইতে ক্ষণকালের জন্য বাংলার আকাশে আসিয়া প্রকাশমান হইয়াছ তাহা জানি না, এবং এখান হইতে কোন্ অজ্ঞাত দেশে যাত্রা করিবে তাহাও জানি না, কিন্তু তবু তোমাকে আজ ১৬ই নভেম্বর ১৯৪৮ তারিখে অভ্যর্থনা জানাই।

ইতিপূর্বে সীমাহীন শূন্যের সংসারে তোমাদের জ্ঞাতিবর্গের অনেকের সঙ্গেই মানুষের পরিচয় ঘটিয়াছে; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, মানুষের কাছে আজ পর্যন্ত তোমাদের বংশের কেহ অভ্যর্থনা পায় নাই। ইহার কারণ সম্ভবত এই যে মানুষ যুগযুগান্ত ধরিয়া প্রকৃতির বহু প্রতিকূল শক্তির সহিত বাস করিয়া তাহাদের ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও এবং মোটামুটি তাহাদের অধিকাংশের চরিত্র বুঝিয়া লওয়া সত্ত্বেও এখনও তাহাদের সকলকে সে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতে পারে নাই। এরূপ অবস্থায় আকাশপথে নবাগত কোনো জ্যোতিষ্কের আবির্ভাবে তাহার মনে নানারূপ সন্দেহ জাগিবারই কথা। সুতরাং তাহার এই অবিশ্বাস স্বাভাবিক। আশা করি এই কথাটি বুঝিয়া তুমি মানুষকে ক্ষমা করিবে।

বলিতে পার মানুষের মধ্যে যাঁহারা মননশীল, যাঁহারা দার্শনিক, তাঁহারাও এককালে ধূমকেতু দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন: বলিতে পার প্রাচীন জ্ঞানী চীনারা ধূমকেতু বংশকে সন্দেহের চোখে দেখিয়াছেন, মহাজ্ঞানী প্লেটো অত্যন্ত অপমানজনক ভাষায় ধূম্রলাঞ্ছনকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সুনিয়ন্ত্রিত বিশ্বজগতে ধূমকেতু এক মহা উৎপাত, এরা ভিক্ষুকের মতো শৃঙ্খলাহীন (শৃঙ্খলহীনও বটে।) ভবঘুরে disorderly vagabonds। কারণ ধূমকেতুর আবির্ভাবেই নাকি আথেন্স ও প্যালেস্টাইনে কতকগুলি গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়াছিল। তিনি খ্রী পূঃ চারি-শতকে তোমাদের গোষ্ঠীর কোন্‌টিকে দেখিয়াছিলেন জানি না।

ভারতবর্ষের লোকেরাই কি ধূমকেতুকে সুনজরে দেখিয়াছে? ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দে প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির ধূমকেতুর নাম দিয়াছিলেন অপশকুন। জানি এই নামটি তোমার কাছে অত্যন্ত অপমানজনক; অবশ্য যদি শকুনের চেহারা এবং চরিত্র দেখিয়া থাক। শকুন দেখিয়া থাকিলে অপশকুন যে কি তাহা অবশ্যই বুঝিয়াছ। এই ভারতীয় নামের জন্য ভারতবাসী আমরা তোমার নিকট মার্জনাভিক্ষা করি—

মার্জনাক্রিয়া তোমার কোটি মাইল দীর্ঘ পুচ্ছরূপ সম্মার্জনীর একটি মৃদু হেলনের ব্যাপার মাত্র। সুতরাং বঞ্চিত হইব না এ বিশ্বাস আছে।

হে ক্ষণিকের অতিথি, ভাবিয়া দেখিও ধূমকেতু নামটিও ভারতবর্ষীয় নাম, এবং এই নামের মধ্যে অসম্মানজনক কিছু নাই। তাহা ভিন্ন প্রাচীন ইংরেজ সমাজেও কেহ কেহ ধূমকেতুর আবির্ভাবকে শুভ বলিযা মনে করিযাছে, তাহারা বলিয়াছে তোমাদের আবির্ভাবে আঙুব মিষ্টতর মদ্য দান করে, অবশ্য কতকগুলি লোক সেই সঙ্গে ইহাও বলিয়াছে যে তাহাতে ট্যাক্স বৃদ্ধি হয়। তবে সন্দেহবাদীর সংখ্যাই যে বেশি ইহাতে সন্দেহ নাই। কারণ ১৪৫৮ সালে ইউরোপের প্রার্থনা ছিল Save us from the Devil, the Turk and the comet.

আপন ক্ষমতা ও বুদ্ধির প্রতি যে-মানুষের বিশ্বাস নাই, তাহারাই ধূমকেতুর আবির্ভাবের সঙ্গে কোনো না কোনো দুর্ঘটনা বা বিপর্যয়কে কার্যকারণসম্ভূত বলিয়া প্রমাণ কবিবার চেষ্টা কবিযাছে। তাহার দৃষ্টান্ত, ১০৬৬ সালে William the Conqueror-এর ইংল্যাণ্ডে অভিযান চালাইবাব ঠিক পূর্বে ধূমকেতু (পরে ইহাই হ্যালির ধূমকেতু নামে বিখ্যাত) দেখা গিযাছিল, এবং ১৯১০ সালের ধূমকেতুই নাকি চার বৎসব পরের ইউরোপীয় প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য দাযী। কিন্তু আমরা জানি ইহা নিতান্তই কুসংস্কাব। কাবণ ইহাই যদি অবশ্যম্ভাবী নিযম হইত তাহা হইলে ভারতের ভাগ্যাকাশে ১৯৪৭ সালের গোড়াতেই তোমার দেখা মিলিত। ভারত বিভক্ত হইবার অব্যবহিত পূর্বে দেখা দিলে সর্বজনীন হত্যাকাণ্ড ও ভারত বিভাগের সমস্ত দাযিত্ব তোমাব ঘাড়ে চাপাইযা দেওযা যাইত। সেই দাযিত্ব অগত্যা চাপিল গিয়া চার্চিলদের ঘাড়ে।

কিন্তু তোমার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, এবং তুমি স্বজাতিকে কলঙ্কমুক্ত দেখিতে চাও বলিয়াই ওসব শেষ হইবার পরে আসিযাছ। কিন্তু তবুও সসঙ্কোচে একটি প্রশ্ন করি—মহরমের মধ্যে না আসিলেই কি চলিত না?

তুমি তরুণ যাত্রী, কোথাযও স্থির হইয়া থাকিবার জন্য তোমার লেশমাত্র ব্যাকুলতা নাই, তোমার পথের সঙ্গে, পরিচিত গ্রহ উপগ্রহের নির্দিষ্ট কক্ষপথের কোনো মিল নাই, যেন তুমি আকাশের অন্তহীন নীলসমুদ্রের অজ্ঞাত বক্ষ মথিত করিয়া কোন্ অজ্ঞাত প্রশ্নের উত্তর খুঁজিযা বেড়াইতেছ। আমাদের মনেও মহা প্রশ্ন আছে। আমরা তাহার উত্তর পাই না। দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ এবং বহুবিধ যন্ত্রপাতি লইয়া উন্মাদের মতো বিরাট অন্ধকারে বসিয়া একবিন্দু আলো খুঁজিতেছি, তুমি কি সেই আলোর সন্ধান কিছু পাইয়াছ? যদি পাইয়া থাক, জানাইয়া যাও।

অথবা কোনো স্বর্গীয় মন্ত্রিসভার দূতরূপে চিরদিন কেবল T. A. (রাহাখরচ) মারিতেছ ?

না, অসৎসংসর্গে থাকিয়া এ বৃথা সন্দেহ। তোমাকে তরুণ যাত্রী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি। তোমার চরিত্র দেখিয়া তাহাই মনে হয়। কারণ তুমি শুকতারার কাছাকাছি আছ। ঐ শুকতারা কত কবিকে কাব্যে প্রেরিত করিয়াছে। ঐ ভীনাস কত শিল্পীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তোমার মধ্যেও একটি তরুণ শিল্পীমন রহিয়াছে, তাই তোমার উদয় উহার কাছাকাছি জায়গায়।

তোমার আত্মীয়তা হ্যালির ধূমকেতুর সঙ্গেই বেশি, বৈজ্ঞানিকদের কথায় তাহাই মনে হয়। খ্রীঃ পূঃ ২৪০ সালে তোমার আর এক জ্ঞাতি দেখা দিয়াছিল। মুয়ারহাউস ধূমকেতু তোমার কে হয় জানি না, দেখা দিয়াছিল ১৯০৮ সালে। গ্রীনিজের মানমন্দিরের তোলা ফোটোগ্রাফ দেখিয়াছি। সে সময় তাহার পুচ্ছের দৈর্ঘ্য ছিল অত্যন্ত কম, কিন্তু দেড় মাসের মধ্যে সেই দৈর্ঘ্য অত্যন্ত বাড়িয়া যায় এবং তাহার মাথাটিও উজ্জ্বলতর হইয়া ওঠে। ইহার কারণ অবশ্য পরে জানা গিয়াছে।

১৮১১ সালের ধূমকেতুটির পুচ্ছ ছিল দশ কোটি মাইল দীর্ঘ। কেতুর বদলে পুচ্ছ বলিলাম মনে কিছু করিও না, ভাই। অন্যগুলিরও পুচ্ছ-দৈর্ঘ্য অতি সাংঘাতিক। ১৮৮২ সালের ধূমকেতুর দৈর্ঘ্য ছয় কোটি মাইল। ১৮৬১ সালে এক বহুপুচ্ছ (পেখমধরা ময়ূরের মতো) ধূমকেতু দেখা দেয়, তাহার পুচ্ছ ছিল দুই কোটি চব্বিশ লক্ষ মাইল। ১৮৪৩ সালেরটির ছিল দুই কোটি মাইল, ১৮৫৮ সালেরটির ছিল সাড়ে চার কোটি মাইল।

১৮৪৬ সালে বিয়েলা ধূমকেতু কোন্ এক অজ্ঞাত অপরাধে দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায় এবং তাহার পর হইতে সেই ধাক্কায় বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া শেষ পর্যন্ত তাহার খণ্ডগুলি উল্কারূপে প্রতি নভেম্বরে পৃথিবীতে নামিয়া আসিতেছে। আমরা তাহা এই নভেম্বরে এখন প্রায় প্রতি রাত্রেই দেখিতেছি।

১৯১০ সালের ধূমকেতুর পুচ্ছ ছিল এক কোটি মাইলের বেশি। এইটিকে আমি দেখিয়াছি। প্রথমত দেখার জন্য রাত্রি জাগিয়াছি। তাহার পর সন্ধ্যা হইতে না হইতেই সেটি অর্ধাকাশ জুড়িয়া পুচ্ছবিস্তার করিয়া থাকিত, দেখিয়া দেখিয়া পুরাতন হইয়া গিয়াছিল। আবার তাহাকে দেখা যাইবে ১৯৮৫সালে। এই ধূমকেতুটিই বেশি প্রচারলাভ করিয়াছে কারণ ১৬৮২সালে জ্যোতির্বিদ এডমণ্ড হ্যালি বলিয়াছিলেন ১৫৩১ এবং ১৬০৭ সালে ইহাকেই দেখা গিয়াছে, ১৬৮২ সালেও

তাহারই আবির্ভাব ঘটিয়াছে এবং ভবিষ্যতে ৭৫ হইতে ৮০ বৎসর পরে তাহাকেই আবার দেখা যাইবে। ১৯১০সালে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়াছিল। তখন হইতে পৃথিবীর সমস্ত সাময়িক পত্র বিনা পয়সায় প্রচার চালাইয়া হ্যালির ধূমকেতুকে এত বিখ্যাত করিযাছে। তবে ১০৬৬ সালে ইহার যে পরিমাণ উজ্জ্বলতা ছিল ১৯১০ সালে তাহা নাকি আর ছিল না। বৈজ্ঞানিকবা বলেন, হ্যালি ভাঙিতে শুরু করিযাছে।

তোমাদেব উৎপত্তি কোথা হইতে জানা যায নাই, এখনও তাহা রহস্যময়। অজ্ঞাতকুলশীলকে তাই লোকে ভয় কবে ; কিন্তু বিজ্ঞান এই কুসংস্কারকে দূব করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। পৃথিবী বহুবার ধূমকেতুব পুচ্ছ ভেদ করিয়া গিয়াছে ; কিন্তু পৃথিবী ধ্বংস হয় নাই, যেমন ছিল তেমনি আছে এবং মহা আড়ম্বরে প্রতি শতাব্দীতে চার পাঁচটি করিয়া বিশ্বযুদ্ধেব আযোজন কবিতেছে।

বৈজ্ঞানিকরা মনে কবেন, গ্যাসই তোমাদেব উপাদান। বর্ণালিবীক্ষণের সাহায্যে পুচ্ছের আলো বিশ্লেষণ কবিযা তাঁহাবা এই অনুমান সত্য বলিযা মনে করিয়াছেন। তোমাদেব নক্ষত্রবৎ মাথাটি অপেক্ষাকৃত নিরেট পদার্থে গড়া। (ইহা তোমাদেব মগজেব প্রতি কটাক্ষপাত নহে) কেহ কেহ অনুমান কবিযাছেন মাথাটি গ্যাসের মেঘে ঘেবা অনেকগুলি উল্কাব সমষ্টি এবং পুচ্ছটি উক্ত মস্তক-বিক্ষিপ্ত বাষ্পের ধারা। গ্যাসের আবরণ সমেত তোমাদের মাথাব ব্যাস নাকি এক লক্ষ মাইল পর্যন্ত দীর্ঘ হইতে পারে, ভিতরের কেন্দ্রটি আট হাজার মাইল পর্যন্ত। কিন্তু তোমাদের পুচ্ছের রহস্য এখনও ভেদ হয নাই। সূর্যের কাছাকাছি না আসিলে তোমাদের পুচ্ছের জন্মই হয না। তাহার পব সূর্য হইতে দূবে যাইবার সময পুচ্ছটি সম্মুখেব দিকে ঘুরিয়া যাইতে থাকে। সুতবাং এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, সূর্যের প্রভাব তোমাদের উপরে যথেষ্ট। এই সূর্যই তোমাদের মাথা হইতে নির্গত পুচ্ছটিকে দূবে সরাইয়া দেয় এবং তোমাদের যে অংশ সূর্যের বিপবীত দিকে সেই দিকে ফিরাইয়া রাখে। কেহ বলিয়াছেন, সূর্যের বহির্ভাগ নেগেটিভধর্মী বিদ্যুৎ-আবিষ্ট এবং তোমাদের মাথার মধ্যেকার ঘনীভূত কণিকাগুলিও নেগেটিভ বিদ্যুৎ-আবিষ্ট। তাই পুচ্ছটি সূর্যের বিপরীত দিকে ধাবিত হয়।

তোমরা নাকি ব্যোমপথে নক্ষত্র হইতে নক্ষত্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াও এবং এই ঘোরার পথে কয়েকদিনের জন্য আমাদের সূর্য-নক্ষত্রটির অতিথি হইয়া থাক। কিন্তু জ্যোতিবিদেরা নাকি ক্রমশই এই সিদ্ধান্তে পোঁছাইতেছেন যে, তোমরা এই সৌরজগতেরই অধিবাসী। আমরাও তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি, কারণ তাহাতে আত্মীয়তা-

বোধ বেশি জাগে।

হে বন্ধু, জ্যোতির্বিদেরা তোমার নাম দিয়াছেন "১৯৪৮-কে"। ঠিক নামই দেওয়া হইয়াছে, কারণ ১৯৪৮ সালে তোমার এই আবির্ভাবের অনেক পূর্বে আমাদের কবির কাব্যে তোমার পূর্বাভাস ধরা পড়িয়াছিল। সেই কবিতায় তোমার ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ।

তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি
কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী।

এই "কে তুমি"-ই "K-তুমি"। তাহা ভিন্ন "কে তুমি" দুটি শব্দ "কেতু মি" এইভাবে লিখিলেও প্রচ্ছন্ন কেতু কথাটি স্পষ্ট হইয়া ওঠে। সুতরাং অভিনন্দন সময়ে ঐ গানই গাওয়া হইবে।

কথাটি হঠাৎ মনে আসে নাই। কারণ ধূমকেতুর ধর্মের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কল্পনার একটা যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নহে। কারণ রবীন্দ্রনাথ যেকালে জন্মিযাছেন সেই কালে বাস করিযাও তিনি তাঁহাকে এতখানি অতিক্রম করিযা গিযাছেন যে, কবিরূপী রবীন্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভাবে তিনি তাঁহাব সমসামযিক কালের নিকট হঠাৎ একটা দুর্দান্ত বিপর্যয বলিযা প্রতিভাত হইয়াছিলেন। এবং তিনি যে সমাজ সাহিত্য ধর্ম সব কিছু ওলটপালট করিয়া দিবেন এই রকম একটা মূঢ় ভীতিতে তখন অনেকেই কম্পিত হইয়াছিলেন। ঠিক যেমন ধূমকেতুর আবির্ভাবে লোকে মূঢ়বৎ আতঙ্কগ্রস্ত হইযা থাকে।

কিন্তু নিজের কল্যাণকর ক্ষমতা সম্বন্ধে কবির নিজের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যাহারা নূতনকে দেখিয়া ভয় পায তাহারা জীর্ণ অর্ধমৃত; যাহারা নূতনকে বরণ করে তাহারা চিরযুবক, তাহারা প্রাণবান; তাহারা স্বভাবতই কৃত্রিম বিধিবিধান ভঙ্গকারী। ধূমকেতুও তাই। তাই তিনি যৌবনকে আহ্বান করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন—

যৌবন রে তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে।
তুই যে পারিস কাঁটাগাছের উচ্চ ডালে পুচ্ছ নাচাতে।

ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, যৌবনধর্ম ও ধূমকেতুধর্ম যে অভিন্ন তাহা কবির দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে, কারণ একমাত্র যৌবন এবং ধূমকেতুই কাঁটাগাছের উচ্চ ডালে বসিয়া পুচ্ছ নাচাইতে পারে। ১৯১০ সালে হ্যালির পুচ্ছ যাঁহারা দেখিয়াছেন

তাঁহারা ইহা বুঝিবেন। সুতরাং হে বন্ধু, তোমার আবির্ভাব অমঙ্গলসূচক একথা এ যুগের প্রগতিবাদী যৌবনধর্মীরা বিশ্বাস করিবে না। তুমি যতদিন ইচ্ছা আমাদের অতিথি হইয়া থাকিতে পার, আমরা খুশিই হইব। যদি সম্ভব হয় যাইবার পূর্বে একবার সন্ধ্যাকাশে দেখা দিয়া যাইও কারণ শেষ রাত্রে ঘুম হইতে জাগিয়া ছাতে ওঠা বড়ই অসুবিধাজনক। তিনদিন চেষ্টা করিয়া পারি নাই, চতুর্থ দিন ছাতে উঠিয়া দেখি আকাশ মেঘাবৃত। পঞ্চম দিন দেখি সূর্য উঠিয়া গিয়াছে। তোমাকে দেখিতে পাইলাম না সেই দুঃখের সঙ্গে কাঁচা সর্দি এক হইয়া চোখ দিয়া জল পড়িতেছে।

(১৯৪৮)

মহাত্মাজি, ঘড়ি ও ব্রিটিশ জাতি

সংসাবে সবাই ছুটছে, কাবো সময় নেই। অফিসেব লোকেরা অফিসে ছুটছে, ছাত্রছাত্রীবা স্কুল কলেজে ছুটছে, উকিল আদালতে ছুটছে, ডাক্তার রোগীব কাছে ছুটছে, বোগী ডাক্তাবেব কাছে ছুটছে, কাগজের হকাররা বাড়ি বাড়ি ছুটছে, রাজনীতিকেবা সভায় ছুটছে, কেউ প্রতিবাদ জানাতে ছুটছে, কেউ পাল্টা প্রতিবাদেব জন্য ছুটছে। মিলিটাবি পুলিস গুণ্ডাদেব পিছনে ছুটছে (এ বিষযে মতভেদ আছে যদিও) গুণ্ডাবা পথচাবীর পিছনে ছুটছে, আক্রান্ত প্রাণবক্ষাব তাগিতে ছুটছে। সময় নেই—সময় নেই। কে ডাকছ? সময় নেই। তোমাব কি কাজ? ভয়ানক ব্যস্ত এখন, সময় নেই বলবাব। কখন সময় হবে?—জানি না, কিন্তু এখন সময় নেই। কাবো সময় নেই, সবাই ব্যস্ত। হিন্দুস্থান থেকে কেউ পাকিস্থানে যাবাব জন্য ব্যস্ত, পাকিস্থান থেকে কেউ হিন্দুস্থানে যেতে ব্যস্ত। বাউণ্ডারি কমিশন ব্যস্ত, কংগ্রেস ব্যস্ত, হিন্দু মহাসভা ব্যস্ত। দেশীয় বাজ্য ব্রিটিশের মুখ চেয়ে ছুটছে, ব্রিটিশবা কৌশলে দেশী-বাজ্যেব বন্ধুত্বেব লোভ দেখিয়ে ভাবতবর্ষকে ডোমিনিযনে বাখতে ছুটছে। ঘডি ধরে কাজ, ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড ধবে কাজ, একটা মুহূর্ত কারো ফস্‌কে যাবার উপায নেই।

এই ব্যস্ততাব বিভ্রান্তিকব আবহাওয়ায একটি লোক সকল ব্যস্ততার উর্ধ্বে অসীম ধৈর্যেব সঙ্গে প্রশান্তমনে হিংসাবিদ্বেষহীন সমাজেব স্বপ্ন দেখছেন। মহাত্মা গান্ধী গভীব অন্ধকাবে ঘন অবণ্যেব মধ্যে পথ হাবিযেও ধৈর্যহারা হন না, সবিশ্বাস পদপাতে নিশ্চিন্ত পথেব অব্যর্থ সন্ধানে বত থাকেন। গভীব বিশ্বাস, অবিচলিত আশা, নিষ্কলুষ নির্ভীকতা তাঁব বৈশিষ্ট্য, তাঁর ধর্ম। এই বিশ্বাস, আশা ও নির্ভীকতা তাঁকে সব সময সাফল্যের তীবে উত্তীর্ণ কবে না হয তো, হয তো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর সাধনাব অব্যবহিত ফল পান না, কিন্তু তাতে তাঁব কিছুই ক্ষতি হয না। তাঁর দৃষ্টি আপাত-বর্তমানকে সব সময়ে ছাড়িযে চলে। ভুল তিনি করেন, কিন্তু সেই ভুলকে স্বীকার করার দুর্জয সাহসও তাঁব আছে। তাঁব কণ্ঠে সকল অবিশ্বাস ভেদ ক'রে ধ্বনিত হয চিববিশ্বাসেব বাণী। ধ্রুব তাঁর সুদূর, লক্ষ্য তাঁর নাগালের বাইরে, কিন্তু যত দূবই হোক, যত দুর্লভই হোক, তাঁর চলায় কখনও অধৈর্য নেই। সকল বর্তমানতা, সকল তুচ্ছতা,

সকল জটিলতার ঊর্ধ্বে বিরাজিত তাঁর লক্ষ্য। তা সব সময়ে স্পষ্টও নয়। সত্য কারো কাছেই স্পষ্ট হতে পারে না, কিন্তু বিশ্বাসে যদি ক্লান্তি না আসে, ধৈর্য যদি অধৈর্যে ভেঙে না পড়ে, তা হলে সেই লক্ষ্যপথের অচঞ্চল পদপাতের তালে তালে সত্য রূপায়িত হয়ে ওঠে সত্যাগ্রহীকে কেন্দ্র ক'রে। তখন তুচ্ছ বর্তমানতাও আর তুচ্ছ থাকে না, তার সঙ্গে গড়ে ওঠে স্থির সত্যের আত্মীয়তা।

একদিকে কর্মব্যস্ত সংসারের ছবি, আর একদিকে চাঞ্চল্যহীন বিশ্বাসের ছবি। এই ছবিটি মনে বেশি ক'রে জাগছে একটি বিশেষ কারণে। ধৈর্য যাঁর অসীম, সময় ধরে যাঁকে প্রতিমুহূর্তে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হয় না, যিনি সময়ের অনুগত নন, সময় যাঁর একান্ত অনুগত, তাঁব ট্যাঁকে একটি ঘড়ি কেন?

ঘড়ি সময়ের চুলচেরা সূক্ষ্ম হিসাবে ব্যস্ত। বস্তুত এই ঘড়িই স্বভাবত-স্থির মানুষকে দিনেব পর দিন অস্থির ক'বে তুলছে, এই ঘড়িই তাকে ভাল ক'রে চিন্তা করতে দেয় না খেতে দেয় না ঘুমোতে দেয না। তাই মহাত্মা গান্ধির ট্যাঁকে একটি ঘড়ি মহা বৈষম্যের হেতু। যিনি লক্ষ্যে পৌছানব জন্য যুগযুগান্তব অপেক্ষা করতে রাজি, তিনি কেন সেই বহুব্যাপক কালকে খণ্ডখণ্ড ক'রে অকারণ কালেব বোঝা বাড়াবেন? যে নিববধিকাল পদ্মপত্রে শিশিব-বিন্দুর মতো মহাত্মাজিকে স্পর্শ করেও সিক্ত করতে পারে না, সেই কালের চূর্ণ অংশের প্রতি তাঁর আসক্তি নিতান্তই বিসদৃশ। তাঁর যুদ্ধ অসত্যের সঙ্গে, অধৈর্যেব সঙ্গে, অসঙ্গতির সঙ্গে এবং এই যুদ্ধ যদিও বর্তমান যুদ্ধের মতো সর্বত্রাসী, সর্বগ্রাসী এবং সর্বাকর্ষী, তথাপি তাঁব যুদ্ধ বর্তমান যুদ্ধের মতো ধৈর্যহারা বিদ্যুৎগতি যুদ্ধ নয়। শত্রুকে এক চবম আঘাত হেনে তাকে ধরাশায়ী করাব মতলব নেই তাঁর যুদ্ধে। তাঁব যুদ্ধ প্রেমের যুদ্ধ, শত্রুকে ভালবেসে জয কবার যুদ্ধ। সকলেই জানেন, কোনো প্রেম বা ভালবাসাই ঘড়ি ধরে জমানো যায না। তাই মহাত্মাজির ট্যাঁকে ঘড়ি অসঙ্গত। চিরকালের লোকের ট্যাঁকে সীমাবদ্ধকালের প্রতীক অসঙ্গত।

মহাভারতের কালে ঘড়ি ছিল না, কিন্তু তবু কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ কিছু খারাপ হয় নি। কুরুক্ষেত্রের অতবড় একটা দার্শনিক যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব-অস্ত্রে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন—যার রিপোর্ট বেরুলো ভগবদ্গীতার আকারে—সে যুদ্ধেও ঘড়ি দরকার হয় নি।

জানি অনেকেই আমাকে প্রতিবাদ করতে উদ্যত হয়েছেন ইতিমধ্যেই।—ঘড়ির সপক্ষে অনেক যুক্তি তাঁদের মনে ভিড় ক'রে এসেছে। আমার নিজেব

মনেও এত এসেছে যে এই মুহূর্তে আমার এই যুক্তি আমারই খণ্ডন করতে লোভ হচ্ছে। কিন্তু আমি এ বিষয়ে নিরুপায়। কারণ মহাত্মাজির ঘড়ির বিরুদ্ধে আমি একমাত্র অভিযোগকারী নই। এ অভিযোগ আমার পূর্বে আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মনে জেগেছে। তবে তিনি তা নিয়ে আমার মতো প্রবন্ধ লেখেন নি, কারণ তিনি কর্মযোগী, তিনি গোপনে মহাত্মাজির ঘড়িটি অপহরণ ক'রে তাঁকে কালেব ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে উদ্ধার ক'রে সীমাহীন মহাকালচক্রের কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন। ওটাই তাঁর উপযুক্ত স্থান। ঘটনাটা ঘটেছিল পাটনা থেকে দিল্লী যাবার পথে—গত মে মাসে।

কিন্তু হায়রে দুরাশা! ইতিমধ্যে ব্রিটিশ ব্যবসায়ী তাঁকে আবার এক ঘড়ি দান ক'রে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সময়ের উপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার ক'রে বসেছে। ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে যাবার আগে বহু রকম সদুদ্দেশ্য প্রচার করা সত্ত্বেও বহু বকম অসৎ কাজ ক'রে গেল, তার মধ্যে এই ঘড়ি দানও একটি। এই দান উপলক্ষে আসলে ভারতের ভবিষ্যতের উপরেই তারা আবার ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেণ্ডের হাত ঘোরাতে থাকবে। এই সঙ্কট থেকে কি কেউ আর মহাত্মাজি ও ভারতবর্ষকে ত্রাণ করবে না? একটি ক্ষীণ আশা জাগছে মনে। খবব বেরিয়েছিল, নতুন ঘড়িটির দিকেও অনেকেই নজর দিচ্ছে। সংবাদটি শুভ! এখন একজনের নজরেও যদি কাজ হয় তা হলেও ইংরেজের প্রভাব থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ চিরমুক্ত হতে পারবে বলে আশা কবছি।

(১৯৪৭)

জাগিল কি ঘুমালো সে

মৃত্যুর পর আমাদের কি হয় এ প্রশ্ন বহু দিনের। এই যে আমি সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করছি, পৃথিবীতে নিজ অধিকার বিষয়ে এত সচেতন, আমার আত্মীয়-স্বজন, আমার বাড়িঘর, আমার দেশ প্রভৃতি বিশ্বাস নিয়ে জীবন কাটাচ্ছি, সেই আমি এ পৃথিবীতে আর থাকব না, চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব, আমার চেতনা থাকবে না, দেহের বাইরে আমি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাব, এ কল্পনা করতে ভাল লাগে না। অথচ মৃত্যুর মতো সত্য আর কি আছে? শুধু তাই নয়, এই মৃত্যু না থাকলে জীবকুলের বিবর্তন বা অগ্রগতিই সম্ভব হত না, এ সত্য উপলব্ধি করেও মন অবুঝ থাকতে চায়।

একটুখানি ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে সমস্ত বিশ্ব কোনো একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে, প্রতি মুহূর্তে তার পরিবর্তন ঘটছে—অবিচ্ছিন্ন, অবিরাম পরিবর্তন, যা কোনো শক্তি রোধ করতে পারে না। এই পরিবর্তনের কোনো অংশ আমাদের প্রত্যক্ষ, কোনো অংশ প্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু তাকে এগিয়ে যেতেই হবে, মৃত্যুর পথে এবং নবজীবনের পথে, রূপ হতে রূপান্তরের পথে। অকল্পনীয় বিরাট বিশ্বকারখানায় এই ভাঙা-গড়ার কাজ চলেছে, কেন চলেছে, কে এ-সব সৃষ্টির মূলে, কে এ সৃষ্টিতে এই গতি দান করল, কার কি উদ্দেশ্য এতে সিদ্ধ হচ্ছে আজ পর্যন্ত মানুষ তার খবর পায়নি।

একটি কেন্দ্রগর্ভ পরমাণু, যা কি না কোনো বস্তু নয়, বিদ্যুতের পার্টিক্‌ল্‌ বা শক্তি কণিকামাত্র, যা অদৃশ্য অনুমানযোগ্যমাত্র তাই বিবর্তনের পথে কি ভাবে কি পরিমাণে একত্র মিলে একটি জীবন্ত কোষ তৈরি হল, কি ক'রে সে খায়-দায় ঘুরে বেড়ায়, নতুন কোষের জন্ম দেয়, আত্মরক্ষা করে এ তথ্য মানুষের অজ্ঞাত।

মানুষ নিজেকেও জানেনা, সে যদি কোনো একটা রহস্যও সম্পূর্ণ ক'রে জানতে পারত—জন্মের অথবা মৃত্যুর—তা হলেও ঐ একটি প্রবেশ-পথে সে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারত, অনেক রহস্যের সমাধান করতে পারত। কিন্তু এখনও সে পথ অনেক দূরে।

জীবনের রহস্য সামান্যই সে জেনেছে চোখে দেখে। অর্থাৎ যেটুকু চোখে দেখে বা গৌণ পরীক্ষায় সে জানতে পেরেছে তা অতি সামান্য, যা জানতে

বাকি আছে তার পরিমাণ বিরাট। তা ভিন্ন তার প্রত্যক্ষ দর্শনেও অনেক ত্রুটি আছে। মানুষের দেহযন্ত্রের মধ্যে যে সব ক্রিয়া চলছে, যে পরিবর্তন অবিরাম ঘটছে, জীবন্ত দেহ উন্মুক্ত ক'রে সেই সব ক্রিয়ার ধারাবাহিকতা দিনের পর দিন লক্ষ্য করা আজও সম্ভব হয়নি। ভ্রূণ দেহ প্রথম দিন থেকে কি কৌশলে প্রতি মুহূর্তে কোষ বিভাজনের সাহায্যে বিচিত্র রূপ ধারণ করছে, জীবন্ত মানুষ থেকে সেই অংশ বিচ্ছিন্ন ক'রে সেই রূপায়ণের ধারা অনুসরণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

যেটুকু জানা গেছে সেই পথ ধরে অনেক কিছু অনুমান করা যায়, অনেক কিছু প্রশ্ন তোলা যায়, আরও অনেক অতৃপ্তি জাগানো যায়, এবং আপাতত সেইটুকুই আমাদের লাভ।

মৃত্যু কি এবং তার শেষে কি,—প্রকৃতির লৌহ-যবনিকা ভেদ ক'রে মানুষ হয়তো একদিন তা জানবে। তার আগে জীবন কি, তা বিজ্ঞানীর সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে যেটুকু ধরা পড়েছে, সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

জানা গেছে দুটি একক কোষদেহ মিলে মানুষের আদি দেহ তৈরি হয়। এই কোষের আকার অতি ক্ষুদ্র, মাইক্রোস্কোপ ভিন্ন দেখা যায় না। এই অদৃশ্য বিন্দুপরিমাণ জীবন্ত কোষ ক্রমশঃ বহু কোষের জন্ম দিতে থাকে, এবং অল্প সময়ের মধ্যে একটি জটিল দেহযন্ত্র তৈরি ক'রে ফেলে। ঐ অণুবীক্ষণদৃশ্য একটি নিষিক্ত কোষের মধ্যে মানুষের স্বভাব-চরিত্র এবং বংশগত অনেক বৈশিষ্ট্য প্রচ্ছন্ন থাকে। এ এক কল্পনাতীত ব্যাপার।

একক-কোষদেহ প্রাণীও পৃথিবীতে অগণিত। প্রথমে একক-কোষ প্রাণীতেই পৃথিবী আচ্ছন্ন ছিল, হয়তো তারও আগে আরও সরল প্রাণকণিকার উদ্ভব হয়েছিল। প্রাণী এবং উদ্ভিদের আদি ইতিহাস এরাই। একটি মাত্র কোষ, অর্থাৎ তার একটি কেন্দ্র আছে, তাকে ঘিরে আছে জেলির মতো খানিকটা বস্তু, হাড়ও নয় মাংসও নয়, কতকগুলি কণিকার সমষ্টি। এই কোষই জীবন্ত বস্তুর ক্ষুদ্রতম ইউনিট। এর জীবনযাত্রা সরল। এই একটি কোষ খায়-দায় ঘুরে বেড়ায়, হয়তো ওদের রীতিতে স্ফূর্তিও করে, তার পর সময় হলেই নিজেকে ভাগ ক'রে দুটো হয়। এরা সবাই স্বাধীন, কিন্তু মানুষের দেহগঠনকারী এই কোষই নিজেদের স্বাধীনতা অনেকখানি বিসর্জন দিয়ে মানুষ নামক আর এক প্রাণীকে গড়ে তুলেছে।

সৃষ্টির আদিতে যখন পৃথিবী ছিল জ্বলন্ত গ্যাস তখন সেই প্রচণ্ড উত্তাপের

মধ্যে ছিল এই জীবনের সম্ভাবনা। সৃষ্টি কোন্ ধাপের পর কোন্ ধাপ এগোবে, তার সমস্ত প্ল্যান ঐ দশ হাজার কোটি ডিগ্রী উত্তাপের মধ্যেই ছিল। বিবর্তন বা পরিবর্তনের পথে জ্বলন্ত গ্যাস থেকে এসেছে আজকের মাটি জল মেঘ গাছপালা জীবজন্তু-পূর্ণ মানুষ-শাসিত এই পৃথিবী।

কোনোটাই হঠাৎ হয়নি, আরম্ভ কোথায়ও একটা ছিলই, অনিবার্য পরিবর্তনের পথে, কোটি কোটি বৎসরের বিবর্তন-শৃঙ্খলের বাঁধা পথে ১৯৫৩ সনের পৃথিবী এসেছে, এসে থেমে নেই, শুধু চলেছে, কিন্তু কোন্ লক্ষ্যে, আমরা জানি না।

প্রাণবিন্দু-পরিপূর্ণ পৃথিবী। অথবা প্রাণীবিন্দু। তারা নিজেরা আত্মবোধ বা চিন্তাক্ষমতাসম্পন্ন নয়, কিন্তু তারা যখন সঙ্ঘবদ্ধভাবে মানুষের ব্যক্তিসত্তা গড়ে তুলল তখন সেই মানুষ হল চিন্তাশক্তিসম্পন্ন। এমন কি যে মস্তিষ্ক চিন্তাশক্তির আধার তারও উপাদান ঐ কোষ।

ঈশ্বর নামক কোনো পৃথক চৈতন্য বা শক্তি সৃষ্টির বাইরে আছে কিনা, মানুষের দেহ বা দেহের কোনো অংশ আত্মা বা চৈতন্য নামক দেহাতীত কোনো পৃথক বস্তুর আধার কি না সে তর্ক থাক। যদি বলা যায় ঈশ্বরও নেই, দেহবাসী দেহাতীত কোনো আত্মাও নেই, তাহলেও মানুষের যেটুকু অবশিষ্ট রইল, অর্থাৎ একটি সম্পূর্ণ মানুষ, সে কি কম আশ্চর্য! যদি ধরা যায় দেহের বিবর্তনের পথেই তার আত্মবোধ ও চিন্তাশক্তি জন্মেছে, দেহ না থাকলে আত্মাও নেই, তাহলেই বা ক্ষতি কি? রহস্য একই থেকে যায়।

কিংবা যাঁরা বলেন আত্মা সম্পূর্ণ পৃথক, তা শুধু মানুষেই ভর করে; কিংবা যাঁরা বলেন সৃষ্টিতে দুটি সমান্তরাল অস্তিত্ব আছে—বস্তুর ও আত্মার, বিভিন্ন স্তরের দেহে বিভিন্ন স্তরের আত্মা এসে আশ্রয় নেয়, তাহলেও সৃষ্টিরহস্য একই থেকে যায়।

আসলে ঈশ্বর আছে কি নেই সে তর্ক হচ্ছে দর্শনের। মানুষের জীবন বা মৃত্যুরহস্য তার বাইরে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক উপায়ে পরীক্ষা ক'রে দেখায় বাধা নেই। বৈজ্ঞানিকেরা পৃথক আত্মায় বিশ্বাসীও নন, অবিশ্বাসীও নন। পৃথক আত্মা থাকতে পারে, কিছুমাত্র আপত্তি নেই, বরঞ্চ সেটি আবিষ্কার করার গৌরবও তাঁরাই নিতে চান, তাই দেহে আত্মার গুপ্ত বাস কোথায় তা তাঁরা সন্ধান করতে ব্যস্ত। বিভিন্ন ধর্মমতে ঈশ্বর বা মানুষের আত্মা সম্পর্কে বিভিন্ন যে সব ধারণা আছে, তার সঙ্গে বিজ্ঞানীর কোনো বিরোধ নেই। ধর্মমতের বাইরে এসে বুদ্ধির পথে পরীক্ষার পথে কতটা সত্য পাওয়া যায় তাই তাঁরা দেখছেন।

যদি এমন শক্তিশালী অণুবীক্ষণ পাওয়া যেত যার সাহায্যে একটি পরমাণুকে একটি বড় মুক্তার আকারে দেখা সম্ভব হত তাহলে কত না রহস্য ভেদ হতে পারত! যদি এমন চোখ থাকত, তাহলে সে চোখে পৃথিবীতে আর কোনো বস্তুকেই দেখা যেত না, দেখা যেত শুধুই পরমাণু। এমন অবস্থায় মানুষের একটি চুল সম্পূর্ণ ক'রে দেখতে কোটি কোটি বছর কেটে যেত। এক-একটি পরমাণু এক-একটি সৌরজগৎ বিশেষ। সেইখানেও সূর্যকে ঘিরে গ্রহ-উপগ্রহ ঘুরছে। কোনো পরমাণুই নিরেট বস্তু নয়, কোনো দুটি পরমাণুই পরস্পর অবিচ্ছিন্ন ভাবে পরস্পরের গায়ে লেগে নেই। প্রত্যেকটি পরমাণু-কেন্দ্রকে ঘিরে বিদ্যুৎ-কণিকারা অবিরাম ঘুরপাক খাচ্ছে, জায়গা ছেড়ে দিতেই হবে তাদের জন্য। একটি পরমাণুর তুলনায় একটি কোষ তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড! অতএব পরমাণু দেখবার মতো সাদা চোখ পেলে পৃথিবীর এই বিচিত্র রূপ আর দেখা যেত না, সবই হত তখন একই চেহারার একঘেয়ে পরমাণুপূর্ণ পৃথিবী।

এই পরমাণু জগতের সন্ধান মানুষ পেয়েছে, এবং বুঝেছে যে বিশ্বরহস্য বড়ই গোলমেলে, আদৌ সরল নয়। তাই শুধু হাতে বসে বসে কল্পনা ক'রে অনেক রকম তত্ত্ব খাড়া করা যেতে পারে, আসল রহস্যের সন্ধান তাতে পাওয়া সম্ভব নয়। হাতে-কলমে তবু তো খানিকটা পাওয়া গেছে, বাকিটা আর তবে শুধু বিশ্বাস ক'রে লাভ কি? যে-কোনো অপরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত বিশ্বাস করলেই হল, যে-কোনো মুহূর্তে বিশ্বাস করার স্বাধীনতাও আছে সময়ও পড়ে আছে যথেষ্ট। ইতিমধ্যে বিশ্বাস অবিশ্বাস শিকেয় তুলে হাতে-কলমেই পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক না। এই হচ্ছে বিজ্ঞানীর মনোভাব।

প্রথমতঃ জীবন বলতে কি বোঝায় তা দেখবার চেষ্টা করেছেন বিজ্ঞানীরা জীবনের লক্ষণ এই: জীবন যার আছে সে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার ব্যবস্থা নিজে করতে পারে, নিজের মতো প্রাণীদেহের জন্ম দিতে পারে, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করতে পারে, আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি তার আছে, একটা সীমা পর্যন্ত আহত হলে সেই আহত স্থান সারিয়ে তুলতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি।

সবচেয়ে সরল জীবনধারী হচ্ছে এককোষ প্রাণী, আর সবচেয়ে জটিল প্রাণধারী হচ্ছে মানুষ। মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে কতকগুলি বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সে চিন্তা করতে জানে, বিচার-বিশ্লেষণ করতে জানে, তার মানসিক বৃত্তি অত্যন্ত জটিল, সে নিজেকেও বিচার করতে জানে, আপন অনেক অভ্যাস ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ

করতে জানে। মানুষের এই মনই তাকে আত্মজিজ্ঞাসায় উদ্বুদ্ধ করেছে। পৃথক আত্মা আছে কি না তাও একমাত্র মানুষেবই প্রশ্ন।

জটিলতম প্রশ্ন হচ্ছে পৃথক আত্মা যদি থাকে তবে তা দেহের কোথায় থাকে? অর্থাৎ কোন্ একটি মাত্র দেহ-অংশের বিকাব ঘটলে আত্মা তাকে ছেড়ে যায়, তাব মৃত্যু হয়? আত্মা সকল দেহে ছড়িয়ে থাকে, না এক জায়গায় থাকে? যদি একখানা হাত কেটে বাদ দেওয়া যায় তাহলে কি আত্মাব কোনো অংশ নষ্ট হয়? কিন্তু হাত পা কাটা পড়লেও মানুষ সম্পূর্ণ আত্মবোধ নিয়ে বেঁচে থাকে, তাহলে হাত বা পা অথবা নাক কান কোথায়ও আত্মা থাকে না।

দেহের অভ্যন্তরের কথাও তাই। পিলেটা কেটে উড়িয়ে দিলেও আত্মা দেহছাড়া হয় না। লিভার-অ্যাবসেস হলে কেউ বলে না যে সোল-অ্যাবসেস হযেছে। পেটের ভিতরকার দীর্ঘ অন্ত্রের খানিকটা কেটে বাদ দিলেও মানুষ মানুষই থাকে। ফুসফুসের অংশ কেটে বাদ দেওযা হযেছে, হৃৎপিণ্ডেও অস্ত্র-প্রযোগ ক'বে দেখা গেছে মানুষ একই ভাবে বেঁচে থাকে। আত্মা ফুসফুস অথবা হৃৎপিণ্ডে যে থাকে না তার আর এক প্রমাণ, ও দুটোবই কাজ সাময়িক ভাবে সম্পূর্ণ বন্ধ ক'রে কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুসেব সাহায্যে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। আধুনিক বিজ্ঞানের একটি বড় আবিষ্কার হার্ট লাঙ্ মেশীন।

আরও ঊর্ধ্বে ওঠা যাক। আত্মা মগজের মধ্যেই কোথাও থাকে এইটে শেষ পর্যন্ত সন্দেহ হয; কিন্তু এখানেও গণ্ডগোল। আমাদেব জিজ্ঞাস্য হচ্ছে মগজের কোন্ অংশ বাদ দিলে তবে মৃত্যু হয? মগজেই যদি আত্মা থাকে তবে গলা কেটে মাথাটিকে পৃথক করলে মানুষ মারা যায় কেন? রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়াতে? তাহলে কি রক্তই আত্মার প্রধান খাদ্য? অর্থাৎ আত্মা রক্ত-পায়ী জীব? কল্পনা করতে কষ্ট হয।

এর উত্তরে বলা যায স্বাভাবিক বক্ত-চলাচল-সম্বলিত সুস্থ মগজ না থাকলে আত্মা সেখানে থাকতে পারে না আত্মা নিজে রক্তপায়ী নয়। কিন্তু এ কথার প্রমাণ কি? অনেক যোগীকে দেখা গেছে তাঁরা যোগবলে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত হৃৎস্পন্দন বা রক্ত-চলাচল সম্পূর্ণ থামিয়ে রাখতে পাবেন, নাড়ীতে জীবনের লক্ষণ থাকে না, কিন্তু তবু তাঁবা জীবিত থাকেন। অনেক রোগীকে দেখা গেছে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হওযার পর কৃত্রিম প্রক্রিযায় নিশ্বাস নেওয়ায় সাহায্য করাতে বেঁচে উঠেছে। আমার পরিচিত এক সুস্থ ব্যক্তিকে একটি ফোড়াব জন্য অস্ত্রপ্রয়োগের পূর্বে ক্লোরোফর্ম দেওয়াতে তার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, অর্থাৎ মারা গিয়েছিল।

কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে হৃৎপিণ্ডকে উস্কে দিতেই আবার সে বেঁচে উঠেছে। অনেক জলে-ডোবা 'মৃত' ব্যক্তিকে এইভাবে বাঁচানো হয়ে থাকে, সবাই জানে।

আত্মা বলতে আমাদের মনে যে অস্পষ্ট ধারণা আছে তার পৃথক অস্তিত্ব থাকলে তা বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসত কি? তবে কি সে দেহের সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে আবার দেহের সঙ্গে জেগে ওঠে? এবং ক্লোরোফর্ম দিলে আত্মা অজ্ঞান হয়? কিংবা মৃত্যুর পরেও আত্মা দেহেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে? যদি করে তবে কতক্ষণ করে? এবং কোথায় করে?

প্রশ্ন কিন্তু এখানেও শেষ হয় না। ভ্রূণ অবস্থায় যখন কোষসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পিণ্ডদেহটি মানুষের আকার নিতে থাকে, সে সময় সে অবশ্যই জীবন্ত প্রাণী। কিন্তু আত্মা তাতে যোগ হয়েছে কি? যদি হয়ে থাকে তবে ভ্রূণদেহের আত্মবোধ বা চিন্তাশক্তি নেই কেন? তবে কি আত্মারও শৈশব এবং বৃদ্ধত্ব আছে? এ কথা কল্পনা করা যায় না।

কিন্তু এ কথা কল্পনা করা যায় যে মানুষের মগজ যত পরিপুষ্ট হয় তত তার চৈতন্য বা আত্মবোধ বা চিন্তাশক্তি স্পষ্ট হয়, কারণ মগজই তার চিন্তাশক্তির জন্ম দিচ্ছে। তার অর্থ, আত্মবোধ বাদ দিয়ে (যেমন ভ্রূণ দেহের) মগজ থাকতে পারে, কিন্তু মগজকে বাদ দিয়ে আত্মবোধ বা চিন্তাশক্তি থাকতে পারে না। এই চিন্তাশক্তি বা চিন্তাজাত নীতিবোধ বা আত্মবিচার ক্ষমতাই যদি আত্মা হয়, তাহলে আত্মাহীন মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব। প্রাণ এবং আত্মা তাহলে সম্পূর্ণ পৃথক এবং এমন অনেক মানুষ বেঁচে আছে যাদের আত্মা নেই। অর্থাৎ আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়েছে বললেই যে মৃত্যু হয়েছে বোঝায়—সে কথা সত্য নয়। মানুষ আসলে মরে যখন সে প্রাণে মরে, আত্মায় নয়।

জে. বি. এস. হলডেন বলছেন, পৃথক সোল বা আত্মা যদি থাকে তবে তাকে এক এক টুকরো ক'রে বাদ দেওয়া যায়। "If there is a detachable soul it can certainly be detached bit by bit" বহু রকম পরীক্ষান্তে তিনি এ কথা বলেছেন। ব্রেন সার্জারি যাঁরা করেন তাঁদের কাছে এ পরীক্ষা পুরাতন হয়ে গেছে।

তাঁরা দেখেছেন সম্মুখভাগের মগজের অনেকখানি বাদ দিলে মানুষ শুধু বেঁচে থাকে তাই নয়; তার স্মৃতিশক্তি, বোধশক্তি ও পেশীশক্তির বিশেষ কিছু হানি হয় না, শুধু কাজের উৎসাহ কমে যায়। সবখানি বাদ দিলে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর মতো বেঁচে থাকে।

লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অযুত নিযুত জীবিত কোষদ্বারা গঠিত দেহ পরস্পরের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা, কিন্তু তবু সকল কোষের মূল্য সমান নয় সমগ্র জীবন্ত মানুষের সম্পর্কে। দেহে যে কোষরাশি আছে তারা সঙ্ঘবদ্ধ—organized। এই সঙ্ঘবদ্ধ দেহে যত কোষ আছে, প্রয়োজন হিসাবে তাদের প্রাণধর্মের স্তরভেদ আছে। কোনো কোনো অঙ্গ নষ্ট হলে সে জন্য দেহের গুরুতর কিছু ক্ষতি হয় না। আবার কোনো একটি অঙ্গ নষ্ট হলে কোষদের সঙ্ঘবদ্ধতা নষ্ট হয়, এবং মানুষের মৃত্যু ঘটে।

যে অঙ্গের যা কাজ, তা পৃথক হয়েও পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে একের ক্ষতি অপরের মারাত্মক ক্ষতি করে। ফুসফুস নষ্ট হলে হৃৎপিণ্ড বন্ধ হতে পারে, হৃৎপিণ্ড নষ্ট হলে ফুসফুসের কাজ অচল হয়। এদের যে-কোনো একটি অকেজো হয়ে গেলে কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের দেহকোষগুলির সঙ্ঘবদ্ধতা ভেঙে যেতে থাকে। তারা সবাই মিলে যে ব্যক্তি মানুষকে গড়ে তুলেছিল, তখন তারা নিজেরা জীবিত থেকেও ব্যক্তি-মানুষকে আর বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। এবং কিছুকালের মধ্যে তারাও মরে যেতে থাকে।

আরও একবার জীবন কাকে বলে দেখা যাক।

তরল জিনিসে সাঁতার কেটে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে হালসংযুক্ত একক-কোষের একটি জীব, আর একটি একক-কোষের জীবের গায়ে মাথা ঠুকল গিয়ে। শেষোক্ত জীবটি তাকে বলল ভিতরে এসো। তাকে নিজের অন্তরে গ্রহণ করল, কিন্তু বলল তোমার হালখানা বাইরে রাখ, এখন আর ওর দরকার নেই। হাল খুলে ফেলে ভিতরে আশ্রয় নেবামাত্র তারা একদেহ হয়ে গেল। এইবার চলল তাদের মানুষ গড়ার কাজ। এই একটি নিষিক্ত কোষ নিজেকে অদ্ভুত কৌশলে ভাগ ক'রে দুটো হল, তারপর সেই দুটো চারটে হল, চারটে আটটা, থামল না, চলল এই বৃদ্ধির কাজ। একটা পিণ্ডবৎ কিছু গড়ে তুলল তারা কয়েক দিনের মধ্যে। প্রথম কোষ-বিভাগ আরম্ভের দিন থেকে তারা পরামর্শ ক'রে কেউ হল চেপ্টা, কেউ হল সুতোর মতো, কেউ হল পাস্তুয়ার মতো, কেউ রইল আগের মতোই গোলাকার। একটি কোষ কত রকম কোষের জন্ম দিয়ে চামড়া, হাড়, রক্ত, মাংস, চুল, নখ, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড প্লীহা, যকৃৎ কিড্‌নি, মগজ, স্নায়ু, গ্ল্যাণ্ড, এবং ভবিষ্যৎ মানুষ সৃষ্টির উপাদান সম্বলিত একটি মানুষের জন্ম দিল। মগজ-হীন কোষ-ওয়ার্কশপের সব দিকের মোটামুটি গড়ন শেষ করতে ন'মাস আন্দাজ গোপনবাস দরকার, তারপর তাকে প্রকাশ্যে বের ক'রে দেওয়া হল। এবারে

সে বাইরের প্রকৃতি থেকে সাহায্য নিয়ে বাকি গড়ার কাজটুকু শেষ করবে। মূলে সেই একটি অণুবীক্ষণদৃশ্য কোষের এই পরিণাম। বহু জীবন (কোষমাত্রেই জীবিত) মিলে একটি সঙ্ঘবদ্ধ জীবন। একটি কোষের আত্মবোধ নেই, কিন্তু সমস্ত কোষ মিলে যে ব্যক্তিকে গড়ল তার আত্মবোধ আছে।

দেহযন্ত্রের মধ্যেকার সকল কাজ সেই ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে ঘটে চলেছে, সে সব কাজ করার ভার কোষেরাই নিয়েছে শুধু তারা খুব বিপন্ন হলে কোষাধ্যক্ষকে জানাবে, কোষাধ্যক্ষ তখন ডাক্তার ডাকবে। মানুষের দেহটা তাদের কো-অপারেটিভ ভাণ্ডার। তাদের এখন নিজেদের স্বাধীন বৃদ্ধি আর নেই, শুধু যেখানে ক্ষয়, সেখানে মাত্র নতুন কোষ বৃদ্ধি হয়ে সেই ক্ষয়পূরণ। কোনো একটি কোষ অকারণ আর নিজেকে বিভক্ত ক'রে উদ্দেশ্যহীন ভাবে কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি করছে না। যদি কোনো কোষ আইন অমান্য ক'রে নিজেকে স্বতন্ত্র ভাবে বাড়াতে থাকে, তাহলেই কোষাধ্যক্ষ মানুষটির বিপদ। এই রকম বৃদ্ধি ক্যানসারের মূর্তি ধরে। প্রথম দিকে ধরা পড়লে সেই বৃদ্ধিকে সমূলে কেটে বাদ দিতে হয়। তখন নিষ্ঠাবান কোষেরা নতুন কোষ তৈরি ক'রে ক্ষত স্থানকে জুড়ে দেয়। দেহস্থ কোষেরা স্বাধীনভাবে ব্যক্তির প্রয়োজন বাদ দিয়ে বাড়ে না, কিন্তু দেহ থেকে কোষ খুলে নিয়ে বৃদ্ধির উপযুক্ত পৃথক পরিবেশে রাখলে আবার সে স্বাধীন ভাবে বাড়তে থাকে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে দেহের মধ্যেকার কোষদের পৃথক সত্তা ও জীবন যেমন সত্য, তাদের সামগ্রিক মিলনে যে ব্যক্তির আবির্ভাব তার ব্যক্তিসত্তাও তেমনি সত্য। ব্যক্তিকে গড়ে তোলার জন্যই তাদের সার্থকতা, তাই তারা নিজেদের খেয়াল বা স্বাধীনতা সবই প্রায় ঐ ব্যক্তির পায়ে সমর্পণ করেছে।

মানুষের এই ব্যক্তিসত্তাই মানুষের পরিচয়। সে জীবন্ত মানুষ। বলি না যে সে কোষের সমষ্টি। বিশ্বকোষের মাঝখানে তার ব্যক্তিসত্তা নগণ্য হলেও পৃথিবীতে সে একটি উল্লেখযোগ্য কোষাধ্যক্ষ। তার সামগ্রিক ভাবে যে একটি পৃথক সত্তা আছে তারই অভাব হলে আমরা বলি মানুষ বেঁচে নেই।

গানের কথা ও স্বরলিপি বা যে সুর ঐ গানের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে, তাদের মিলনেই শুধু গান হয় না. গানের কথাগুলি সেই সুরে গাইলে তবে তা গান। অর্থাৎ গান, ঐ কথা ও সুরকে আশ্রয় ক'রে অথচ অতিক্রম ক'রে তবে গান হয়। কথা ও সুর বাদ দিলে গানের কোনো অস্তিত্ব থাকেনা। কথা ও সুরকে আশ্রয় ক'রে গান, বস্তুকে আশ্রয় ক'রে বর্ণ, তেমনি দেহকে আশ্রয় ক'রে জীবন বা

আত্মা বা আত্মবোধ বা চৈতন্য। কথা ও সুর-বিচ্ছিন্ন গান, বস্তু-বিচ্ছিন্ন বর্ণ, এবং ব্যক্তি-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসত্তা কল্পনা করা সম্ভব হয় না।

আধুনিক কালে ল্যাবরেটরিতে বা অস্ত্রবিদ্যার ক্ষেত্রে যে সব পরীক্ষা চলছে তাতে কোনো প্রাণীর কি অবস্থা ঘটলে তাকে মৃত বলা যায় তা এক সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

অনেক ব্যাধিব জীবাণু বা জার্ম বা ব্যাক্টেরিযা, জীবাণুনাশক বাসাযনিক প্রযোগের পর মরে যাবার ডাক্তাবি সার্টিফিকেট পাওযাই তাদেব জীবনেব শেষ মনে করা হযেছে এতদিন, কিন্তু আধুনিক পবীক্ষায দেখা যাচ্ছে অনেক 'মৃত' জীবাণুই পুনবায় পৃথক কালচাব মীডিযামে বা উপযুক্ত আহার-বাসস্থানের পবিবেশে জীবন্ত হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানী মহলে এই আবিষ্কাব কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে।

মানুষেব মৃত্যুও অনেকখানি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। মানুষের দেহ থেকে সমস্ত বক্ত বেব ক'বে নিলে তাব মৃত্যু হয। কিন্তু নতুন বক্ত দিয়ে আবার তাকে বাঁচিয়ে তোলা যাচ্ছে। সদ্যমৃত সৈনিককে এ ভাবে বাঁচানো হয়েছে। অল্প-দিন হল কেপটাউনে একটি তিন বছবেব ছেলেব দশ বাব বক্ত বদল কবা হযেছে চাব মাসেব মধ্যে। খববটি বযটাব প্রচাব কবেছে গত ৫ই সেপ্টেম্বব। প্রত্যেক বাবই তাব দেহ থেকে সমস্ত বক্ত বেব ক'রে নেবাব দবকাব হযেছিল। সে এখন ভাল আছে।

১৯২৯ সনে রুশ মনোবিজ্ঞানী ডক্টর ব্রিউখোনেনকো এই বিষযে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি একটি কুকুবেব দেহ থেকে সমস্ত রক্ত বের ক'রে নেন এবং পুনবায নতুন বক্ত দিযে তাকে বাঁচান। শিবায অক্সিজেনপূর্ণ নতুন রক্ত চালনা করা হযেছিল। এব পব থেকে অনেকেই হার্ট-লাঙ্ মেশীনের সাহায্যে 'মৃত' কুকুরকে বাঁচিযেছেন এবং সে সব কুকুবেব অধিকাংশই পবে স্বাভাবিক জীবন যাপন কবেছে। এই কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড-ফুসফুস যন্ত্রের সাহায্যে, রক্ত চলাচলের এবং নিশ্বাস নেবার স্বাভাবিক পথকে ঘুরিযে দিযে, মানুষের দেহাভ্যন্তরস্থ হৃৎপিণ্ড বা ফুসফুসকে সামযিক ভাবে ছুটি দেওযা সম্ভব হযেছে—প্রযোজনমতো অস্ত্রপ্রযোগেব সুবিধার জন্য।

ডক্টর ব্রিউখোনেনকো কুকুব নিযে আরও ভযাবহ এক পরীক্ষা করেছেন। তিনি প্রথমে একটি কুকুরের গলা কেটে মুণ্ডটি সম্পূর্ণ পৃথক করেন, তারপব তার রক্ত চলাচলের সেই বিচ্ছিন্ন অংশের সঙ্গে তাঁর কৃত্রিম যন্ত্রটি সংযুক্ত ক'রে অক্সিজেন-পূর্ণ রক্ত চালনা করতে থাকেন তার ছিন্নমুণ্ডে। কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড এবং

ফুসফুস এবং মাত্র সেই মুণ্ডটি। তবু দেখা গেল সেই মুণ্ডটি জীবিত কুকুরের মতোই ব্যবহার করতে লাগল। তার চোখ ছুঁয়ে দেখা গেল চোখ বন্ধ হয়, চোখের ভ্রূ টানলে ভ্রূ কুঁচকে যায়, নাকের মধ্যে কিছু প্রবেশ করালে ঝিল্লি সাড়া দেয়। তার পর তার মুখে খাদ্য দেওয়া হল, খেল সে সেই খাদ্য, যদিও অন্য দিক দিয়ে তা বেরিয়ে গেল।

এই যে ক্ষণকালের জন্যও মৃত জীবিতের মতো ব্যবহার করল, এর থেকে কি সিদ্ধান্ত করা যায়? মৃত্যু তবে কি?

ডাক্তার রোগীর পাশে বসে মৃত্যু ঘোষণা করলেন রোগীর, কারণ রোগী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে, হৃৎপিণ্ড চলছে না, পাল্‌স্ নেই, অতএব রোগী মারা গেছে এই মর্মে তিনি সার্টিফিকেট লিখে দিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানীরা অনেক ক্ষেত্রে এখন এই সার্টিফিকেট দেখেও জোর ক'রে বলতে পারছেন না সত্যই মৃত্যু ঘটেছে কি না। শ্মশানে গিয়ে অনেক 'মৃত'কে আবার ফিরিয়ে আনতে হয়েছে, এ কাহিনী আমাদের দেশে অনেক দিনের। একখানা আমেরিকান কাগজে মৃত্যু বিষয়ে একটি প্রবন্ধেও আশী বছর বয়সের এক বৃদ্ধের এই ভাবে বেঁচে ওঠার কথা বলা হয়েছে। এই বৃদ্ধ মারা যাবার সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে কফিনে ঢোকার আগে বেঁচে উঠল, তারপর তাকে এক হাসপাতালে নেওয়া হল এবং সেখানে কিছুক্ষণ জীবিত থেকে দ্বিতীয় বার মৃত্যুর সার্টিফিকেট নিয়ে কফিনে ঢুকল।

এ ধরণের ঘটনা নতুন না হলেও অন্যান্য নানা পরীক্ষার সঙ্গে মিলিয়ে একে আবার নতুন দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে, মৃত্যুসম্পর্কে নতুন সব প্রশ্নের মীমাংসায় এই পুরাতন ঘটনাও সাক্ষ্য দিতে এসেছে।

মানুষের দেহযন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ মাত্র। অকল্পিতপূর্ব সব তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। সার্জারিবিদ্যার সাহায্যে মানুষের অনেক অঙ্গ প্রায় ঘড়ির কলকব্জা খুলে মেরামতের মতো মেরামত করা সম্ভব হচ্ছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। চোখের নষ্ট কর্নিয়া খুলে ফেলে সদ্যোমৃতের চোখের সুস্থ কর্নিয়া দ্বারা দৃষ্টিহীনের চক্ষু-দান করা পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে বিশেষ ক্ষেত্রে। দেহের সমস্ত রক্ত ঢেলে ফেলে নতুন রক্তের সাহায্যে যে মানুষকে নবজীবন দান করা হচ্ছে সে আর গর্ব ক'রে বলতে পারবে না যে তার ধমনীতে পূর্বপুরুষের রক্ত প্রবাহিত।

এই সব পরীক্ষার সাহায্যে দেহাতীত আত্মার সন্ধানও করা হচ্ছে, কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বরঞ্চ বিপরীতটারই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

এই পথে চলে ভবিষ্যতে কখনও যদি নিশ্চিত প্রমাণ হয় দেহ-বিচ্ছিন্ন আত্মা নেই, তাহলে মানব-সমাজের খুব ক্ষতি হবে মনে হয় না। আর যদি প্রমাণ হয় আছে, তাহলে আপাতত মানুষের বহুদিনের বিশ্বাস নাড়া খাওয়ার হাত থেকে বেঁচে যাবে, এবং বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরিতে কাচপাত্রে আত্মা-কালচার করার সুযোগ পাবেন। বস্তুবিশ্লেষণের পথে সৃষ্টির মূল রহস্য তো অনেকখানিই ফাঁস হয়ে গেছে, শুধু কি অবস্থায় কি পরিমাণ বিদ্যুৎকণিকা-গঠিত পরমাণুর যোগাযোগ ঘটালে এবং সেই যোগাযোগ ঘটানো সম্ভব হলে সমচরিত্রের এবং সমব্যবহারের কোষ তৈরি সম্ভব হবে সেইটি জানা যায়নি। অর্থাৎ ভাঙা গেছে, গড়া যায়নি। গড়তে পারলে মানুষই একদিন বহু কোষবিশিষ্ট আত্মবোধসম্পন্ন সম্পূর্ণ মানুষ তৈরি করতে পারবে।

উপাদান রহস্য সে জেনেছে, উপকরণ তার হাতের মুঠোয়, এখন গড়বার মন্ত্রটি জানতে পারলেই তার সাধনা সার্থক হবে। আরও একটি বড় সত্য সে তখন প্রমাণ করতে পারবে—প্রাণীকুলের ধারাবাহিকতা যতদিন অব্যাহত থাকবে ততদিন তার মৃত্যু নেই। সে নিশ্চিত প্রমাণ করবে একক-কোষ প্রাণী দু'ভাগে ভাগ হয়, মরে না, বহুকোষ প্রাণী আপন উত্তর-পুরুষের মধ্যে নিজেকে ভাগ ক'রে বেঁচে থাকে, মরে না। (১৯৫৩)

প্রতিবাদ

আর্টের জন্যই আর্ট এ কথা যাঁরা স্বীকার করেন না, তাঁদের জানা উচিত—অন্তত একটি ক্ষেত্রে ওটি মান্য।—প্রতিবাদের ক্ষেত্রে। বাদ-প্রতিবাদ উদ্দেশ্য-মূলক নয়, নিশ্বাস নেওয়ার মতোই ওটি একটি দৈহিক ক্রিয়া।

যাঁরা দৈনিক বা সাময়িক পত্র সম্পাদনা করেন তাঁরা জানেন কোনো প্রবন্ধ বেরুলেই কোনো না কোনো দিক থেকে তার প্রতিবাদ আসে।

এই যে প্রতিবাদের প্রবৃত্তি, সম্ভবত এটি সহজাত। যাঁরা নিজেরা চিন্তা ক'রে কিছু লিখতে জানেন না, তাঁরা অন্যের লেখা পড়লেই উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন, প্রতিবাদ লিখে ফেলেন চট ক'রে।

প্রতিবাদের প্রবৃত্তি বিরক্তিকর মনে হয়, কথাটা কানেও খারাপ লাগে, শুনলেই মনে হয় ও একটা অন্যায় প্রবৃত্তি। অথচ ভেবে দেখুন, প্রতিবাদ বিশ্ব-সংসারে না থাকলে বিশ্বসংসারই মিথ্যা হয়ে যেত।

আলো অন্ধকার, উচ্চ নীচ, কড়ি কোমল, সত্য মিথ্যা, সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, জীবন মৃত্যু, এ সবই তো এক অন্যের প্রতিবাদ। অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী। অথচ আসলে তা নয়, আসলে এক অন্যের পরিপূরক। অর্থাৎ ওদের এক একটি জোড়া মিলিয়েই আমরা ওদেব পৃথক স্বরূপ জানতে পারি। ডেলিউজের সময় নোয়া এই পরস্পরবিরোধী যুগ্ম সমূহকেই তাঁর নৌকায় আশ্রয় দিয়েছিলেন।

প্রতিবাদ বিশ্বসংসারের একটি মূল নীতি এবং অলঙ্ঘ্য নীতি। এর মধ্যে আমাদের বুদ্ধির খেলা নেই, আমার পছন্দ অপছন্দ এখানে অচল। আদিম কাল থেকে এই বিরোধ আছে, হেগেল সাহেব কেবল তাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় প্রকাশ করেছেন মাত্র।

আমরা জীবনের প্রতি মুহূর্তে যে বিরোধ এবং প্রতিবাদ অভ্যাস করেছি, কলহ, দ্বন্দ্ব, মামলা মোকদ্দমা,—তা যদিও এই নীতির মতো অলঙ্ঘ্য নয়, তবু এর মূলে যে ঐ একই বিশ্বনীতি ক্রিয়া করছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। শুধু, মানুষ সংসারে আপাত দৃষ্টিতে খানিকটা স্বাধীন ইচ্ছায় চলতে পারে বলে, প্রতি-বাদের চেহারাটা স্বভাবতই কিছু বদলে গেছে। ইচ্ছা করলে (সাময়িক পত্রের পাঠক ভিন্ন) মানুষ অবিলম্বে প্রতিবাদ যোগ্য বিষয়েরও প্রতিবাদ না

জানিয়ে চুপ ক'রে থাকতে পারে। এমন কি যাঁরা বিষয় বুদ্ধিতে পাকা তাঁরা এই কাজটি, অর্থাৎ নীরব থাকার নীতিই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পালন ক'রে থাকেন। উপরন্তু উপযুক্ত সময়ে চুপ ক'রে থাকাকেই অনেকে অনেক সময় চতুর বুদ্ধির লক্ষণ বলে ধরা হয়।

অনেক দিন আগের একটি ঘটনা বলি। আমি ট্রামে চলছিলাম, খুব ভিড়, তারই মধ্যে কোনো রকমে দাঁড়িয়ে আছি এবং বিনা প্রতিবাদে কনুয়ের গুঁতো খাচ্ছি, এমন সময় দূরের আসনে উপবিষ্ট এক ভদ্রলোক বললেন, মশাই, আপনার পকেটটা দেখুন তো কিছু চুরি হয়েছে কি না। কারণ মনে হল যেন যে-লোকটা নেমে গেল সে আপনার পকেটে হাত দিচ্ছিল।

বুদ্ধিমান লোক, চুরির সময় প্রতিবাদ করলেন না, চোর চলে যাবার পরে আমাকে বললেন। এই জাতীয় বিজ্ঞ লোকেরা কোথায় চুপ ক'রে থাকতে হবে তা ভাল করেই জানেন। রাইট টাইমে রাইট কথা না বলাই হচ্ছে উইস্‌ডম।

যথাসময়ে প্রতিবাদ না করার এই যে স্বাধীনতা, এর অপব্যবহার ঐ ভাবে হতে পারে ভয়েই দায়িত্বশীল রাষ্ট্র মাত্রেই প্রতিবাদের একটি আদর্শ স্থাপন করা হয়েছে—দরকার হলে প্রতিবাদীকে সমন জারি ক'রে আদালতে টেনে আনবার রীতি প্রচলন ক'রে। অর্থাৎ রাষ্ট্রনীতি স্বীকার করছে বাদী থাকলে প্রতিবাদীকেও থাকতে হবে। গণতান্ত্রিক সরকারও বিরোধী দল পালন ক'রে থাকেন। এই বিরোধীদল প্রতিবাদের মূল আদর্শটি বজায় রেখে চলে।

আমাদের রক্তের অণুপরমাণুতে একটি বিরোধী দলের সত্তা মিলিয়ে আছে। রক্তের মধ্যকার শ্বেত কণিকাগুলো বিরোধী দলের সভ্য। বাইরের কোনো বীজাণু দেহে প্রবেশ করলে তারাই প্রতিবাদ করে এবং তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আয়োজন করে।

প্রতিবাদের প্রবৃত্তি মাঝে মাঝে সংযত রাখতে হয়, বলেছি। সংযত রাখার ক্ষেত্র ব্যাপক।

একটি ঘটনা বলি। একটি সংগীত বিষয়ের সভা, স্থান ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট, বছরটা মনে নেই, ত্রিশ বছর বা আরও বেশি আগে। বাঙালী গায়ক সদ্য বিলেত থেকে ফিরেছেন, বিলিতি সঙ্গীতের ডিগ্রী নিয়ে। নাম তাঁর দিলীপ-কুমার রায়। এ সভার সভাপতি সবুজপত্র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী।

দিলীপকুমার সঙ্গীতের বিভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা করবেন, কথা ও গানের সাহায্যে। এই উদ্দেশ্যেই সভার আয়োজন। কিন্তু শ্রোতারা অবুঝ। তারা কথা শুনতে

চায় না, বলে শুধু গান শুনব। সভায় দারুণ গোলযোগ। গায়ক স্বয়ং বোঝাতে গেলেন, ফল হল না। তখন নিরুপায় হয়ে সভাপতি দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন—"বুঝতে পারছি, বক্তৃতা শোনবার মতো মনের অবস্থা আপনাদের নেই। বক্তৃতা আপনাবা পছন্দ করছেন না। কিন্তু একটি কথা ভেবে দেখবেন আপনারা—এবং আপনাদের মধ্যে যাঁবা বিবাহিত, বিশেষ ক'বে তাঁদের উদ্দেশে বলছি—আমার বিশ্বাস, পছন্দ হয় না এমন অনেক জিনিস সহ্য করা আপনাদেব অভ্যাস আছে।"

তুমুল হাস্যধ্বনিতে সভাঘর ভেঙে পডল। আশ্চর্য ফল ফলল ঐ সামান্য কথাটিতে। বিনা প্রতিবাদে অনেক জিনিস আমরা নীরবে সহ্য করি এ সত্যটি মনে জাগামাত্র শ্রোতাবা প্রতিবাদ বন্ধ ক'রে বক্তৃতা ও গান শুনতে লাগল।

বাইরে প্রতিবাদের যে অভ্যাসই থাক, ঘবে যে সে-অভ্যাসের চেহাবা অন্য রকম তা প্রমথ চৌধুবী মহাশযের ইঙ্গিতটিতে স্পষ্ট। এব আবও স্পষ্ট একটি রূপ আছে একটি বিলিতি কাহিনীতে।

এক বৃদ্ধ দম্পতির বিবাহিত জীবন ষাট বছব পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে তাঁরা হীবক জযন্তীব অনুষ্ঠান কবছিলেন। অভ্যাগতদেব মধ্যেকার একজন বন্ধু উক্ত বৃদ্ধকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, এমন দীর্ঘজীবী সুখী দম্পতি তিনি আর দেখেননি।

সৌভাগ্যবান বৃদ্ধ বললেন, আমাদেব দীর্ঘকাল শান্তিতে থাকার কারণ খুব সহজ। বিবাহিত জীবনের গোড়াতেই আমরা একটি শর্ত ক'রে নিয়েছিলাম এই যে - ছোটখাটো ব্যাপারগুলিতে স্ত্রী যা বলবেন তাই হবে। বড় বড় ব্যাপাবে আমি যা বলব তাই হবে।

বেশ জোর গলায় গর্বেব সঙ্গে বৃদ্ধ এই খবরটি তাঁর বন্ধুকে শোনালেন।

বন্ধু বিস্মিত হযে প্রশ্ন করলেন, "এই ষাট বছরের মধ্যে কোনো বড় ব্যাপারেই তোমার স্ত্রী কখনও হস্তক্ষেপ করেনি?"

বৃদ্ধ এদিক ওদিক চেয়ে একটু চাপা স্বরে বললেন, "আজ পর্যন্ত বড় ব্যাপার একটিও ঘটেনি।"

বৃদ্ধ ষাট বছর পরে সম্ভবত এই প্রথম প্রতিবাদ জানাল তার বন্ধুর কানে কানে, চাপা স্বরে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিবাদের এই চাপা রূপ। প্রতিবাদের প্রবৃত্তি থাকা মনের সুস্থতার পক্ষে দরকার, কিন্তু এই প্রবৃত্তি এখন শুধু অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে। তাতে অনিষ্টই বেশি হবে। নাগরিকতা-বোধের অভাবে নগরবাসী হওয়া

সত্ত্বেও হাজার হাজার লোক স্বাস্থ্যবিরোধী, সৌন্দর্যবিরোধী হয়ে পড়ছে প্রতিদিন। আর এক দল অবিরাম তার প্রতিবাদ ক'রে চলেছে, অর্থহীন ভাবে। দুটিই অভ্যাস মাত্র।

এই প্রতিবাদের অভ্যাস কতখানি যান্ত্রিক হতে পারে তার চমৎকার একটি ছবি আছে রবীন্দ্রনাথের প্রত্নতত্ত্ব নামক ব্যঙ্গ রচনায়।

কুঞ্জবিহারী ও মধুসূদন শাস্ত্রী এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রত্নতাত্ত্বিক। এদের একজন কিছু বললেই আর একজন প্রতিবাদ করে। এর কোথাযও ব্যতিক্রম নেই। কুঞ্জবিহারী নিজেই বলছে, "মোহান্তক ও জ্ঞানাঞ্জন নামক গ্রন্থে যদি গ্যালভানিক ব্যাটারি ও অক্সিজেন বাষ্পের কোন উল্লেখ না পাওয়া যায়, তবে তাহা হইতে কি প্রমাণ হয় বলা শক্ত। শুদ্ধ এই পর্যন্ত বলা যায় যে উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের সময়ে গ্যালভানিক ব্যাটারি ও অক্সিজেন আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু সে সময়টা কি, তাহা আমি অনুমান করিলে মধুসূদন শাস্ত্রী মহাশয় প্রতিবাদ করিবেন, এবং তিনি অনুমান করিলে আমি প্রতিবাদ করিব তাহাতে সন্দেহ নাই।"

সংসারে বাদ প্রতিবাদ চলেছে বিচিত্র রূপে। দুইয়ের দ্বন্দ্বে অনেক সময় মানুষের মাথা ভাঙে, প্রাণ যায়, কিন্তু তবু মানুষের ইতিহাস আর এক ধাপ এগিয়ে চলে। (১৯৫৪)

হাসির উপকরণ

যারা প্রাণখুলে হাসতে জানে তাদের নাকি স্বাস্থ্য ভাল থাকে। কথাটা সত্য। মন প্রফুল্ল থাকলে আমাদের স্নায়ু খানিকটা বিশ্রামের সুযোগ পায়, তার উপরকার চাপ কমে আসে, এটি সত্য কথা। দেহযন্ত্রের অন্যান্য নানাবিধ ক্রিয়াও এজন্য অবাধে চলতে পাবে।

এজন্য ইংরেজরা কৌতুকহাস্যকে জীবনে একটি বড় স্থান দিয়েছে। ওদের দেশের সাহিত্যে রঙ্গব্যঙ্গকৌতুকেব সম্মানজনক স্থান। ওরা কৌতুকহাস্যের নাম দিযেছে ডাক্তাব। তার মানে কৌতুকহাস্য অনেক অসুখ ভাল ক'বে দেয।

আমাদের জীবনে হাসির কাবণ নানাবিধ। তবে প্রধানত মানুষের জীবনে অসঙ্গতির যে একটি দিক আছে সেইটেকে একটু বাড়িযে দেখলেই আমরা সাধারণত হাসি। আমবা প্রবন্ধ লেখায বা পাঁচজনের সঙ্গে ব্যবহাবে যে সঙ্গতি রাখবাব চেষ্টা করি, ব্যক্তিগতভাবে আমবা সবাই অল্পবিস্তর তাব বিপবীতধর্মী। যে লোকটি রচনায লিখেছে চুরি কবা পাপ, সে হয তো নিজে চোর। মানুযের জীবনে এটাই বড় ট্র্যাজেডি, আদর্শেব সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের এখানেই অসঙ্গতি, এবং এই অসঙ্গতি কোনো না কোনো আকারে সকল মানুষের জীবনেই আছে। সংসারে আদর্শ মানুষ বলে কোনো মানুয নেই। থাকা উচিতও নয়, কেননা তাহলে আদর্শ মানুষ আর পশুতে কোনো তফাৎ থাকত না। সে হত একটি যন্ত্র মাত্র। আর্টের বিচারেও আদর্শ মানুষ প্রাণহীন।

মনে করুন একটি মানুষ আদর্শ দেহধাবী, (আদর্শ অর্থাৎ পৃথিবীর সকল মানুষের সব দিককার শ্রেষ্ঠ মাপ এবং অনুপাতেব সারাংশ দিযে তাব দেহ তৈরি) তার আদর্শ স্বাস্থ্য, কোনো অসুখ নেই, তার আদর্শ ব্যবহার, অর্থাৎ সে প্রতিদিন যন্ত্রের মতো একই নিয়মে চলে, একই নিযমে কথা বলে, একই মাপে ভালবাসে, একই মাপে হাসে, কাঁদে। এমন মানুষকে সংসারে কেউ ভালবাসতে পাবত না। তাকে দেবতা বানিযে কোনো ঘরে বন্ধ ক'বে রাখত। কাবণ তার জীবনে কোনো দিকে কোনো অসঙ্গতি নেই। আদর্শ মানব মানব নয—দানব, কেননা তার সব দিকে সব কিছু নির্দিষ্ট এবং মাপা, তার কোনো অপূর্ণতা নেই, কাজেই মানুষের সমাজে তার স্থানও নেই।

মানুষের সমাজ অসঙ্গতিতে ভরা। তাই এত বৈচিত্র্য। তাই এত হাসির উপাদান। ক্রটি না থাকলে আমরা প্রায় অচল। সমস্ত মানুষ আদর্শ মানুষ,

কল্পনা করতেও ভয় হয়। কোটি কোটি যন্ত্র পৃথিবীতে মানুষ নাম নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভাবলে বেঁচে থাকাটাই বৃথা মনে হয়। সংসারে যদি চার্লি চ্যাপলিন না থাকত, লরেল হার্ডি না থাকত, তা হলে সংসার মরুভূমি হত না কি? সমস্ত পৃথিবী জুড়ে রয়েছে চার্লি চ্যাপলিন লরেল হার্ডির দল। আমাদের জীবনের বহু অসঙ্গতি আমরা দেখি তাদের মাধ্যমে। আমাদের জীবনের ত্রুটি বিচ্যুতি তাদের মধ্যে প্রতিফলিত দেখতে পাই তাই তাদের দেখে আমরা হাসি, এ হাসি নিজের অসঙ্গতি দেখেই হাসা।

সবচেয়ে দামী গাড়ি রোলস্ রয়েস্-এ যেতে যেতে গাড়ি থামিয়ে অন্য লোকের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট চুরুটের টুকরো কুড়িয়ে খাওয়া—এত বড় ট্র্যাজেডি, এত বড় অসঙ্গতি মানুষের জীবনে আর কি হতে পারে—অথচ আমরা হাসি তা দেখে।

অবসরহীন কাজের লোক, দুঃখী স্ত্রীর কান্নার সান্ত্বনা দিচ্ছে এবং সেই সঙ্গে তার চোখের জলে ডাকটিকিট ভিজিয়ে ভিজিয়ে খামে আঁটছে—ঘটনা শোকাবহ কিন্তু না হেসে উপায় কি।

দুই বন্ধু আফ্রিকার জঙ্গলে হাতীর দাঁতের খনি সন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছে, ওদের ধারণা আইভরি পাওয়া যায় খনিতে। এমন সময় এক হ্রদের ধারে দেখা গেল কতকগুলি জলহস্তীকে। একি জন্তু? জিজ্ঞাসা করল একজন। অন্য জন বল্‌ল, "জন্তুর নাম হচ্ছে হিপোপটেমাস্ অর্থাৎ হিপো।" শুনেই সে তার বন্ধুকে মেরে বসল এক ঘুসি। হতভম্ব বন্ধু প্রশ্ন করল, "মারলি কেন আমাকে?" সে বলল, "এক বছর আগে তুই আমাকে হিপো বলেছিলি, আমি জানতাম না হিপো দেখতে কেমন, তাই তখন কিছু বলিনি।"

মানুষের এই সব দুর্বলতা, এই জাতীয় সব দুঃখ বেদনা ও ট্র্যাজেডিই আমাদের হাসির উপকরণ যোগায়।

একটি লোক তার বন্ধুর ঘরে ঢুকেই দেখে সে কড়িকাঠে দড়ি বেঁধে একটা টুলের উপর দাঁড়িয়ে দড়ির আর এক প্রান্ত কোমরের সঙ্গে জড়াচ্ছে।

"কোমরে দড়ি জড়াচ্ছিস কেন? বিস্মিত লোকটি জিজ্ঞাসা করল।"

তার সেই বন্ধু বলল, "আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি।"

"আত্মহত্যায় তো গলায় দড়ি জড়াতে হয়।"

"গলায় জড়াতে গিয়েছিলাম—বড্ড লাগে।"

এ ধরণের কত নির্বুদ্ধিতা, এবং তার বিপরীত কত বুদ্ধির খেলা, আমাদের হাসায়।

শুধু ঘটনার অসঙ্গতিও আমাদের জীবনে প্রতিনিয়ত ঘটছে।

ঘটনার অসঙ্গতিব কথা বলছিলাম। পাড়াগাঁযের এক থিয়েটারে অভিনযদৃশ্য পরিবর্তনের সময় নারদের দাড়ি সীনের সঙ্গে জড়িয়ে যায। সীনের দড়িতে যত টান পড়ে নারদও তত ঘাড় উঁচু করতে থাকেন—কিন্তু অ্যাক্টিং থামান না। শেষ পর্যন্ত দাড়িব মাযা তাঁকে ছাড়তেই হল এবং পরে অভিনযের মাযাও ছাড়তে হল, কারণ দর্শকরা ততক্ষণে হাসতে হাসতে উন্মাদ হযে উঠেছে।

এই জাতীয অসঙ্গতি এবং নির্বুদ্ধিতা এবং ত্রুটিবিচ্যুতি আমাদের জীবন থেকে চলে যাবে, আমবা আদর্শ মানুষ হব, একথা যে বলে তার প্রতি নজর রাখা দবকার কারণ তার অসাধ্য কোনো কাজ নেই। (১৯৫৩)

তারা ও আমরা

সংসারে লেখক যারা তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা নিঃসন্দেহে বেশি। সে জন্য অধিকাংশ রচনার মধ্যে মেয়েদের প্রতি সুবিচার হয় না।

কিন্তু যদি মেয়েদের সংখ্যাই বেশি হত লেখার ক্ষেত্রে, তা হলে কি তারা পুরুষের প্রতি সুবিচার করত?

ভগবান জানেন করত কি না।

সংসারে বিধি-নিষেধের বেলাতেও দেখা যায় মেয়েদের কথাই ওঠে। লিখিত অলিখিত শত রকম বিধি বিধান তাদের মেনে চলতে হয়। কোথায়ও মুক্তির কথা উঠলে পুরুষেরা মারতে আসে। হিন্দু কোড বিলে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

মেয়েদের স্কুলে আছে আদর্শ গৃহিণী হবার শিক্ষা ব্যবস্থা। ছোটরা প্রথম থেকেই নৈবেদ্য সাজানো, শিবপূজো প্রভৃতি শেখে। আরও একটু বড় হলে তাদের সংসারের হিসাব রাখা থেকে কাপড় ধোয়ার নিয়ম সবই শেখানো হয়। ছেলেরা যেমন বুক-কীপিং শেখে কোনো অফিসে চাকরি পাবে আশায়, মেয়েদেরও তেমনি ডোমেস্টিক সায়েন্স শেখে গৃহিণীর পদ পাবার আশায়। গৃহিণী হওয়াকে তারা চাকরি পাবার সমান মনে করে। অথচ ছেলেদের আদর্শ গৃহস্থ হবার কোনো শিক্ষাই দেওয়া হয় না। মেয়েদের জন্য মাতৃত্বের শিক্ষা আছে, কিন্তু ছেলেরা আদর্শ পিতা হবার শিক্ষা কোনো স্কুলে পায় না।

বাংলা দেশে খবরের কাগজ খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, কিন্তু দৈনিক কাগজ যতগুলো আছে তা সবই পুরুষের দ্বারা চালিত, পুরুষরাই তার সম্পাদক, তারাই এর নীতি-নিয়ামক। কিন্তু খবরের কাগজ যদি জনমতগঠনকারী হবার স্পর্ধা রাখে তবে যে-জনগণের অর্ধেক নারী, তাদেরও মত গঠন করছে পুরুষেরা।

কিন্তু এটা কি ঠিক হচ্ছে? আর এ থেকে কি এটাই প্রমাণ হচ্ছে না যে এ দেশে মেয়েদের কোনো সংগঠনী ক্ষমতা নেই, তারা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে পারে না, তারা কোনো বড় কাজ করতে ভয় পায়?

হয় তো সে কথা, সত্য, কিংবা হয় তো পুরুষ-পরিচালিত কাগজ পড়ে পড়ে

তাদের দ্বারা মেয়েরা এতই প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছেন যে তারাও যে খবরের কাগজ চালতে পারে এ কথা তারা কল্পনা করতে পারে না।

কিংবা হয় তো মেয়েদের সব ক্ষমতাই আছে, তারা সব বিষয়েই পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে এ কথা তারা জানে এবং বিশ্বাসও করে, কিন্তু তাদের চরিত্রের একটি মহৎগুণ তাদেব এ কাজে বাধা দেয়। সে হচ্ছে তাদের স্বভাবসিদ্ধ কোমলতা, ভাবাবেগ এবং মূর্ছাপ্রবণতা। অনেক মেয়ে হয়তো এতে আপত্তি করবে, বলবে ও কথা ঠিক নয়, তামরা নিষ্ঠুর হতে জানি, চিন্তা করতেও জানি, এবং কথায় কথায় মূর্ছা যাই না।

এই কথাগুলোই হচ্ছে শত্রু পক্ষেব কাছে তাদের জবাব। কিন্তু কেন এই জবাব? ভাবাবেগ, মূর্ছাপ্রবণতা, অশ্রুপাত এ সব কি নিন্দনীয়? না এগুলো তাদের বিশেষ গুণ? কাবণ এই গুণগুলিই তাদেব চবিত্রের বারো আনা অংশ দখল ক'রে আছে। বাকি চাব আনার সাহায্যে তারা পুরুষেব সমকক্ষ হয়ে থাকে, এবং শুধু এই কারণে তাবা ক্ষমতায় পুরুষকে অনেক ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে যায়। এ কি সহজ ক্ষমতা?

শত্রুপক্ষ বলে যে তারা তাদেব চিন্তাধাবাকে কোনো সমস্যা সমাধানে অবিচ্ছিন্নভাবে দীর্ঘকাল চালনা কবতে পাবে না। আত্মবক্ষার সহজ সংস্কার অবশ্য তাদেব পুরুষের চেয়ে বেশি আছে, কিন্তু সচেতন চিন্তাধাবার আয়ু তাদের হ্রস্ব। কিছুক্ষণেব মধ্যেই আবেগ এসে চিন্তাধাবাকে রুদ্ধ ক'বে দেয়, ফস্ ক'বে কেঁদে ফেলে।

কিন্তু এই অস্ত্র তো তাদের প্রকৃতি থেকেই দেওয়া। আমরা যেমন কার্যোদ্ধারে বা আত্মরক্ষায় হাতের ব্যবহার করি, মেয়েরা তেমনি ব্যবহার করে আবেগ ও অশ্রু। বিড়াল আত্মরক্ষায় হাতের থাপের ভিতর থেকে নখ বের করে, বোলতা হুল বের কবে। কাজ হলেই হল। ভিন্ন পথে আপত্তি কি? সকল পথই রোমে নিয়ে পৌঁছে দেয়। মেয়েরা আবও বলতে পাবে তাদেব অশ্রু যেটুকু কাজে লাগবাব তা লাগে, কিন্তু অতটা রাসায়নিক দ্রব্য পুরুষেরা অগ্রাহ্য কবে কেন? এই দুর্মূল্যের বাজাবে এতটা বাইপ্রোডাক্ট তাবা নষ্ট হতে দেয় কেন? লণ্ডনের লীডাব কাগজকে সাক্ষ্য হিসাবে দাঁড় কবানো যাক :—

"A woman's tears are one of the strongest natural antiseptics known to science. If a girl's tears are diluted 6000 times they will still kill off scores of different kinds of microbes."

("স্ত্রীলোকের অশ্রু বিজ্ঞানের জানিত প্রকৃতি জাত কড়া পচন নিবারক রাসায়নিক সমূহের অন্যতম। কোনো মেয়ের অশ্রুতে ৬০০০ ভাগ জল মেশালেও তা নানাজাতীয় অনেকগুলো জীবাণু ধ্বংস করতে পারে।)

সুতরাং পৃথিবীতে মেয়েরা যত অশ্রুপাত করে তা শিশিতে ধরে রাখলে দেশের একটা সম্পদ বৃদ্ধি পেতে পারে। জীবাণুনাশক ওষুধের দাম অনেক শস্তা হতে পারে—যা পুরুষের পক্ষে সানন্দে অভ্যর্থনার যোগ্য।

কিন্তু সে কথা যাক। কথা হচ্ছিল মেয়েদের দৈনিক খবরের কাগজ সম্পাদক হতে বাধা কি। বাধা আছে। তারা যে এ দিকে আসে না, সেটা ভালই। কারণ তাদের লেখা সম্পাদকীয়তে এমন একটি দৃষ্টান্ত থাকত, যা একবার পাঠক মহলে প্রচলিত হলে তারা পুরুষের লেখা সম্পাদকীয় পড়ত না। সে জন্য তারা ইচ্ছে করেই এই প্রতিযোগিতায় নামেনি। এটি তাদের মহত্ত্ব।

এই যে এত বড় একটা মহাযুদ্ধ হয়ে গেল, এই যুদ্ধের বীভৎসতার মধ্যে কোনো নারী সম্পাদক থাকলে কি হত, কল্পনা করা যাক। ধরা যাক, জরমান বিমান লণ্ডনের উপর বোমা ফেলে নগরবাসীদের বেপরোয়া হত্যা করেছে, এই বিষয়ে সম্পাদকীয় লেখা হচ্ছে। কিন্তু কপি প্রেসে দেওয়ার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়, কপি আর আসে না। তখন সম্পাদিকার ঘরে গিয়ে দেখা গেল পাঁচ ছ' লাইন মাত্র লেখা হয়েছে, কিন্তু তা সমস্তই চোখের জলে ধুয়ে গেছে—মাত্র শেষ লাইনটি পড়া যাচ্ছে—মা গো! ইহাদের কি হইবে।

শুধু তাই নয়, সম্পাদিকা স্বয়ং সেই লেখার পাশে মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছেন!

পরমাণু যুগে দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে বুদ্ধির খেলা দেখানোর কোনো অর্থ হয় না। কিন্তু সুখের বিষয় নারী এ বিষয়ে পুরুষের নির্বুদ্ধিতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় নামেনি—আশ্চর্য সংযম দেখিয়েছে।

তাই মনে হয় জনমত গঠনে মেয়েরা যে এগিয়ে আসেনি তাতে অন্তত আমাদের মতো রক্ষণশীল সমাজের ভালই হয়েছে। তবু আমাদের দেশে যে মেয়েদের পুরুষ বানাবার কথা ওঠে মাঝে মাঝে, এবং তা বিশ্বাস ক'রে অনেক মেয়ে পুরুষ হবার সাধনায় মাতে, সেটা নিতান্তই দুর্ভাগ্য। পুরুষ যে দেশে পৌরুষ হারাচ্ছে, সে দেশে মেয়েরা নিজে থেকেই পুরুষের স্থান দখল করতে চাইবে, কিন্তু উচিত তা প্রাণপণে রোধ করা। অর্থাৎ পুরুষদেরই পৌরুষ জাগাতে হবে, তা হলেই নারীর নারীত্ব জাগবে।

ইউরোপ প্রভৃতি দেশে নরনারীর বৈষম্য ভেঙে একাকাব করার সাধনা চলছে। তাদের দেশের মেয়েদেব দেখলেও মনে হবে তারা অনেকখানি পুরুষ হতে পেরেছে।

অলিম্পিক খেলায় ইউবোপীয মেয়েদেব প্রতিযোগিতাব কয়েকখানা বীভৎস ছবি দেখে মনে আঘাত লাগল। আঘাত লাগা স্বাভাবিক। কাবণ, আমাদেব দেশে এখনও এমন কোনো সামাজিক বিপ্লব ঘটেনি যাতে নাবীব এই উগ্র আধুনিক রূপ আমাদের অনভ্যস্ত চোখে স্বাভাবিক মনে হতে পাবে। এটা হয় তো আমাব সংস্কার, কিন্তু তবু মনে হয় নবনারী সম্পর্কেব এই উগ্রতাব মধ্যে কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নেই। সমাজেব সাময়িক দাবীতে মেয়েবা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে যুদ্ধ করলেও তা অস্বাভাবিক মনে হবে না কাবণ তাব মধ্যে একটা লক্ষ্য আছে। সমস্ত সমাজ তাব ফল ভোগ কববে, এবং বিপদ কেটে গেলে আবার সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে তাবা হয তো ফিবে আসবে। কিন্তু যে সব হাফপ্যাণ্ট শোভিত মেয়ে খেলার নামে লক্ষ লক্ষ দর্শকেব সামনে পেশী ফুলিয়ে, চোখ দুটি কামানেব গোলাব মতো ছুটিয়ে, মুখে ফেনা তুলে, বুকে পিঠে নম্বর ঝুলিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে বাজি জিতবে বলে, তাদেব দেখলে কি এটাই মনে হয় না যে তারা শুধু দু'চাবটি জন্মচিহ্নের দৌলতেই নারী এবং তাদের দিয়ে সমাজেব কোনো গৌববই বাড়ে না, শুধু নারীত্বেব শিরে পদাঘাত করার জন্যই তাবা আসরে নেমেছে?

কিন্তু এও জানি, এ কাল অতীত কাল হবে একদিন, সেদিন এই হাফপ্যাণ্ট পরা মেয়েদের কথা স্মবণ ক'রে উত্তরপুরুষেরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলবে কি সুন্দর দিনই ছিল মেয়েদের এককালে!—সেই ১৯৫০ সনে। (১৯৫০)

ফ্যাশান

ফ্যাশান কথাটা ইংরেজী—এর কোনো বাংলা নেই, কাজেই ঐ কথাটাকেই আমরা বাংলা ক'রে নিয়েছি। ফ্যাশানকে আমরা বাংলায় অনেক সময় বলি ফ্যাশন। কথাটায় আমরা এমন জিনিসের অস্তিত্ব বুঝি যা চিরস্থায়ী নয়, অত্যন্ত সাময়িক—এবং সেই জন্যই তাকে আমরা একটু বিদ্রূপমিশ্রিত দৃষ্টিতে দেখি। ফ্যাশান কথাটি বিশেষ ক'রে আমরা পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধেই ব্যবহার করি। তাছাড়া একটু ব্যাপক অর্থে আচার, ব্যবহার, সাহিত্য, শিল্প—সব কিছুতেই আমরা ফ্যাশান দেখতে অভ্যস্ত। এবং একথা স্বীকার করতেই হবে যে ফ্যাশান কথাটা বাংলাদেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত স্ত্রী কিংবা পুরুষ সকলেই ব্যবহার করে এবং বাংলা শব্দের সঙ্গে তার পার্থক্য বুঝতে পারে না। "হালফ্যাশানের সব জিনিসই আমাদের দোকানে বিক্রয় হয়", বিজ্ঞাপনের এ কথাটি নিরক্ষর লোকের বুঝতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না।

কিন্তু যে কোনো ফ্যাশানই হোক নগর জীবনেই তার উৎপত্তি। নগর থেকে ফ্যাশান ধীরে ধীরে পল্লীতে প্রচারিত হয়, এবং একবার পৌঁছতে পারলে পল্লীর বুকে তা দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত ক'রে নেয়, সহজে নড়তে চায় না। কিন্তু পল্লীর কোনো ফ্যাশান নগরে প্রবেশ করতে পারে না। পল্লীতে যা আছে তা প্রায় চিরস্থায়ী, সেখানে মৌলিক কিছু আবিষ্কার হওয়া দুঃসাধ্য। আমাদের ফ্যাশানগুলো কলকাতাতেই প্রথম জন্মলাভ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কলকাতাও সব ফ্যাশানের মৌলিকত্ব দাবী করতে পারে না। পোষাক বিষয়ে অন্তত কলকাতায় আমি যত প্রকার ফ্যাশান দেখেছি তার উৎপত্তিস্থল ইংল্যাণ্ড।

বাঙালীর ধুতি চাদর ছাড়া নিজস্ব কোনো পোষাক ছিল না। বাংলা-কোট নামক এক অদ্ভুত কোট কারো কারো গায়ে দেখেছি কিন্তু সেটার বাঙালীত্ব সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। হয়তো সেটা চীনদেশ থেকে এসেছে। বাঙালী বর্তমানে যেটা একেবারে নিজস্ব বলে মনে করছে তার নাম পাঞ্জাবী। পঞ্জাব এবং বাঙলাদেশের মধ্যে অন্তত দুটো প্রদেশ আছে—এই দুটোকে বাদ দিয়ে একেবারে পঞ্জাব কি ক'রে আমাদের গায়ে আবরণ পরাল তা বোঝাই শক্ত। অথচ পঞ্জাব প্রদেশের বহু লোককে কলকাতায় দেখছি, তাদের সবারই গায়ে ইংরেজী শার্ট। কিন্তু পাঞ্জাবীটাকে আমি এখন আর ফ্যাশান বলব না, কেননা

এটা প্রায় স্থায়ীভাবেই আমাদের ঘাড়ে চেপেছে। কিন্তু তাই বলে ফ্যাশানের লীলাক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়নি। আমি দেখেছি এই পাঞ্জাবীর সঙ্গেও উঁচুকলার জুড়ে এর একটা নতুন রূপ দেবার চেষ্টা মাঝখানে চলেছিল, কিন্তু সেটা স্থায়ী হয় নি। বোধ হয় এইজন্য যে বহু পোষাকের মায়ার মধ্যে এই পাঞ্জাবীই একমাত্র ধ্রুব সত্য বলে আমাদের বিশ্বাস জন্মেছে, এখন এটাকেও মায়া বলে উড়িয়ে দিলে আমরা যারা ক্ষণিক মায়া থেকে দূরে সরে আছি, সেই আমাদের আর কোনো আশ্রয় থাকে না। এই উদ্ধত কলারযুক্ত পাঞ্জাবী যদি আমাদের অনাড়ম্বর পাঞ্জাবীকে স্থানচ্যুত করে তবে আমরা ফতুর হয়ে যাব এবং তখন একমাত্র ফতুয়া ভিন্ন আমাদের নিজস্ব বলতে আর কিছু থাকবে না। কলার সম্বলিত পাঞ্জাবীর মৃত্যু অনিবার্য—কিন্তু ভয় ছিল সে নিজে মরবার আগে আমাদের ধ্রুব পাঞ্জাবীকে মেরে না যায়। কিন্তু বাঙালী যুবক চরম আত্মসংযমের পরিচয় দিয়ে এখনও ধ্রুবকেই আঁকড়ে আছে। কিন্তু কালক্রমে পাঞ্জাবীর মৃত্যুও যে অবশ্যম্ভাবী এ কথা জোর করেই বলা যায়। দেশের শাসন ক্ষমতা ক্রমশ দেশের লোকের হাতে আসছে। প্রথম দফা ক্ষমতা লাভ করেও যদি আমরা ঢিলে পোষাক ত্যাগ না করি তা হলে দ্বিতীয় দফা শাসন ক্ষমতা আর পাব কিনা সন্দেহ, অন্তত পাওয়া উচিত নয়। শুধু শাসন ব্যাপারই বা কেন—যে কোনো কাজ যাতে উদ্যম দরকার —ঢিলে পোষাক নিয়ে করা অসম্ভব। ঢিলে ধুতি প'রে দেশ শাসনের দায়িত্ব দেশ রক্ষার দায়িত্ব বহন করা বিপজ্জনক।

একটা কথা বলা দরকার। ফ্যাশান বলতে আমরা পরিবর্তনশীল ক্ষণস্থায়ী কোনো উগ্র চালচলন বা পোষাক বুঝি এ কথা সত্য, কিন্তু এই সাময়িক ফ্যাশান কি ক'রে স্থায়ী এবং আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে তা আমরা অনেক ব্যাপারে দেখেছি। কয়েক বছর আগে চশমা ব্যবহার আমাদের তরুণদের মধ্যে ভয়ানক একটা ফ্যাশান হয়ে উঠেছিল। যাদের দৃষ্টিশক্তির গোলমালের জন্য চশমা নিতে হয় তাদের কথা বলছি না। যাদের দৃষ্টিশক্তির কোনো গোলমাল হয়নি এমন বহু তরুণ, অকারণ শুধু ফ্যাশানের মিথ্যা মোহে দলে দলে রঙীন কাচের চশমা ব্যবহার করত। এটা তারা একটা বিশেষ অলঙ্কার বলে মনে করত। যেমন এখন অনেক কলেজের ছেলে পাউডার এবং ক্রীম প্রসাধন হিসাবে ব্যবহার করে। সেই অকারণ চশমা ব্যবহারের ফলে কিছুদিনের মধ্যে তাদের চোখ সত্যিই খারাপ হল এবং

চশমা ব্যবহার অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল। সেই ফ্যাশান আজও আছে কিনা জানি না, তবে অনেক ছাত্রের চোখ যে শুধু এই কারণেই খারাপ হয়ে পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সুবিধার জন্য অনেক নতুন নতুন জিনিস তৈরি হচ্ছে। এই সব জিনিস ব্যবহার করা সাধারণত ধনীদের পক্ষেই সম্ভব। আমরা যারা সেই সব জিনিস কিনতে পারি না, সেই আমরা সেগুলোকে ফ্যাশান বলে বিদ্রূপ করি। মোটরকার ব্যবহার করা, টেলিফোন রাখা, রেডিও সেট রাখা, একদল লোক এগুলোকে ফ্যাশান বলে গাল দেয়। কিন্তু বর্তমান যুগে এরা মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে—যাঁর সামর্থ্য আছে—তিনিই তা রাখতে পারেন, সুতরাং এগুলোকে ফ্যাশান বলা চলে না। ফাউন্‌টেন পেন এখন আর ফ্যাশান নয়, ঘড়ি হাতে বাঁধাও ফ্যাশান নয়। কিন্তু দু'আনা দামের ফাউন্‌টেন পেন পকেটে রাখলে এবং এক আনা দামের ঘড়ি হাতে বাঁধলে তাকে ফ্যাশান বলা চলে। দামী জিনিসের শস্তা অনুকরণ হওয়াতে আর একটা অসুবিধা হয়েছে। যারা ধনী তারাই দামী জিনিস কিনত। কিন্তু হঠাৎ শস্তা অনুকরণ হওয়াতে গরিবের লজ্জা দূর হয়েছে। এরা দু' আনা দামের ফাউন্‌টেন পেন কিনে অথবা দশ টাকা দামের গ্রামোফোন কিনে অথবা পাঁচসিকে দামের সিল্কের জামা পরে ধনীদের প্রায় সমান হয়ে উঠেছে। যে এক টাকা দামের হাত-ঘড়ি হাতে বাঁধে, আর যে পঞ্চাশ টাকা দামের হাত-ঘড়ি ব্যবহার করে তাদের মধ্যে এখন আর কোনো ভেদ নেই। যার পয়সা কম সে পয়সা নষ্ট ক'রে ধনীর সঙ্গে তার প্রভেদ ঘুচিয়ে ফেলেছে। অনুকরণের এইটেই হল অভিসম্পাত। দরিদ্রের পয়সা যত নষ্ট হচ্ছে ধনীর আভিজাত্যও ততখানি নষ্ট হচ্ছে, কাজেই ধনী এখন ফ্যাশানের নতুন পথ আবিষ্কারে ব্যস্ত। সেইজন্যই এখন ধনীর গৃহে সেকেলে জিনিসের আদর গেছে বেড়ে। সেকেলে ডিজাইনে বাড়ি তৈরি হচ্ছে—বাড়ির আসবাব তৈরি হচ্ছে। দামী বিলিতি ছবি আগে দেয়ালে টাঙানো হত তার শস্তা সংস্করণ হওয়াতে ধনীগৃহে এখন প্রাচীন ভারতীয় স্টাইলের ছবির আদর হচ্ছে। দরিদ্র বেশি খেত, সেজন্য কম খাওয়াটা ছিল ধনীর ফ্যাশান। কিন্তু দরিদ্রের আহার কমে যাওয়াতে ধনী এখন আর বেশি খাওয়ায় লজ্জিত হয় না। জামাই শ্বশুর বাড়ি গেলে আগে খাওয়া বিষয়ে উদাসীনতা দেখাত। এই ফ্যাশানটি সমাজের সকল স্তরের মধ্যেই বিস্তার হওয়াতে, এবং ধনী দরিদ্র সকলেরই প্রকৃত ডিস্‌পেপসিয়া হওয়াতে, এ ফ্যাশানের এখন

আর কোনো মূল্য নেই। এখনকার জামাই খাওয়া বিষয়ে আর উদাসীন নয়; কাজেই শ্বশুর বাড়িতে জামাইয়ের অজীর্ণ বা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগ এখন আর ফ্যাশান বলে গণ্য হয় না।

মেয়েদের নাম রাখা একটা সাময়িক ফ্যাশান। অর্থাৎ এক এক সময়ে এক এক জাতীয় নাম খুব চল্‌তি হয় এবং কিছুদিন পরেই সেই নাম আর চলে না। সে কালের মেয়েদের মধ্যে সৌদামিনী, বিনোদিনী, ক্ষীরোদাসুন্দরী, কৃষ্ণভামিনী, ক্ষান্তমণি, কৈলাসকামিনী, জগদম্বা, নিভাননী বরদাসুন্দরী, ননীবালা এই ধরনের সব নাম বিশেষ আদৃত ছিল। হঠাৎ এক সময়ে এরা একেবারে অচল হল। তখন এলো কণা, কণিকা, মাধুরী, শোভা, আলো, আশা, গীতা, ডলি, লিলি, ইত্যাদি। এই ধরনের নাম বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। কাজেই ফ্যাশানের মর্যাদা আর রইল না। তখন আবার সব অপ্রচলিত নাম খুঁজতে হল। বর্তমানে অলকনন্দা, অরুন্ধতী, আত্রেয়ী, চিত্রা, সুজাতা প্রভৃতির যুগ চলছে। ক্ষান্তমণি ক্ষীরোদাসুন্দরীর যুগ কিছুদিন পরেই আবার আসবে।

এই ভাবে ফ্যাশানের চাকা ঘুরছে। পোষাকে পরিচ্ছদে আচারে ব্যবহারে আহারে বিহারে এক একটা ফ্যাশান আসছে এবং যাচ্ছে। কিন্তু মায়াময় ফ্যাশান-জগতে এমন কি কিছু নেই যা ফ্যাশান হয়েও অপরিবর্তনীয়?

আছে। প্রাচীন কালে ছিল, বর্তমান কালে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। সে হচ্ছে কিছু ধার নিয়ে শোধ না দেওয়া। আমাদের সমাজে দুটো জিনিস ধার নিয়ে শোধ না দেওয়া ফ্যাশান। এক হচ্ছে বই আর এক হচ্ছে টাকা। এই দুটো ফ্যাশানই অমর হয়ে রইল। (১৯৩৭)

আঁধারে আলো

(১)

অন্ধও চক্ষুষ্মানকে চালায।

মানুষের জীবনে এমন মুহূর্ত আসে যখন সে অন্ধকে ডেকে বলে, এবারে তুমি পথ দেখাও।

আকাশবিজ্ঞানী অনন্তকোটি নীহারিকামষ জগতের দিকে চেয়ে চেযে কোথায়ও তার শেষ পাচ্ছে না, সমস্তক্ষণ কল্পনাতীত শূন্যের স্তব স্তবান্তর ভেদ ক'রে জ্যোতিষ্ক জগতের রহস্যে হাঁপিয়ে উঠছে, মাথা ঘুরে যাচ্ছে, কল্পনা ক্লান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়ছে, তার সমস্ত সত্তা চিৎকার ক'রে বলছে—কে আছ পথ দেখাও, আমি দিশাহারা, অসীমেব কল্পনায আমি অবসন্ন, সমস্ত বিশ্বজগৎ আমাব বুকে লক্ষকোটি মণ পাথবেব মতো চেপে বসছে; আমাকে উদ্ধার কর এই আলোব ধাঁধা থেকে- এই শূন্যতাব অপবিমেয রিক্ততা থেকে, এই নিবেট পরিপূর্ণতা থেকে। আমাকে কঠিন মাটিতে নিক্ষেপ কব—কে কোথায আছ।

বৈজ্ঞানিকের স্ত্রী এসে বলল, "কৈ কিছুই তো খাওনি, খাবার সব টেবিলে পড়ে আছে।"

"ও! ঠিক কথা, মনে ছিল না তো।"

বৈজ্ঞানিকের স্ত্রী বিরাট দুববীক্ষণ যন্ত্রেব উচ্চ মঞ্চ থেকে তুচ্ছদর্শন মানুষটাকে টেনে নামিয়ে এনে টেবিলে বসিযে দিল, পাশে বসে খাওয়াল, হাস্য পরিহাস করল, বৈজ্ঞানিকেব সকল অবসাদ দূর হল, সে নিজেকে ফিবে পেল। কোথায় অসীম অনন্ত জগৎ সব শূন্যে মিলিযে গেল। যেখানে পথ দেখা যাচ্ছিল না, সেখানে সে পথ দেখতে পেল। সাধারণ স্ত্রীলোক, অত্যন্ত সামান্য একটুখানি মুষ্টিযোগেব সাহায্যে বৈজ্ঞানিককে শান্ত করল। সে বিজ্ঞানী নয, অসীম অনন্ত (স্বর্ণকারের দোকানে ভিন্ন) জানে না, তার কাজ রান্না করা। বিজ্ঞানীর ভাষায সে অন্ধ, জাগতিক সত্য বিষয়ে অন্ধ। এই নারী নানাস্থানে হারিয়ে যাওয়া একটি মানুষের মনকে জড়ো ক রে শান্ত ক'রে দিল।

(২)

বড় চিকিৎসকের ছেলের অসুখ। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের যত কিছু জানা ছিল, সবই পরীক্ষা করা হযেছে কিন্তু অসুখ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। পবীক্ষায জানা গেছে—টাইফয়েড। বাড়ির আবহাওয়া থমথমে, মাঝে

মাঝে ছেলের মায়ের রুদ্ধ কান্নার অস্পষ্ট স্বর। ছেলের পিতা প্রসিদ্ধ ডাক্তার, কিন্তু তার বুদ্ধি আচ্ছন্ন, অন্য ডাক্তাররাও দ্বিধাগ্রস্ত, এমন সময় এক ফকিরের আবির্ভাব। ফকির নাকি অসুখ সারায় জলপড়া দিয়ে। সবাই ছুটে এলো ফকিরের কাছে; বলল, বাবা, তোমার চিকিৎসাই শুরু কর। ফকির বিজ্ঞানী নয়, বিজ্ঞানীর ভাষায় সে অন্ধ, কিন্তু হয়তো সেজন্যই তার মনে কোনো জিজ্ঞাসা নেই, দ্বিধা নেই, নিজের চিকিৎসা সম্পর্কে তার মনে কোনো প্রশ্ন নেই।

আশ্চর্য কাণ্ড জলপড়ায় ছেলে ভাল হতে লাগল। কেন এমন হল সে প্রশ্ন জাগল না কারো মনে। বিচার করলে হয়তো দেখা যেত অসুখ আপনা থেকেই সেরে গেছে, হয়তো রোগীর ভোগের কাল শেষ হয়ে এসেছিল। এ রকম হয়। কেন হয় তা কেউ বলতে পারে না, এর আপাতত কোনো ব্যাখ্যা নেই। শরীর আপনা থেকেই ব্যাধি সারায় এই তার ধর্ম, ওষুধ অনেক সময় সাহায্য করে, অনেক সময় করে না, অনেক সময় আবার শরীর প্রস্তুত থাকলেও ব্যাধিকে সে তাড়াতে পারে না, ওষুধই তাড়ায়। অনেক সময় ওষুধের ফল ফলতে কিছু দেরি হয়। হয়তো এ ছেলেটিকে যে সব ওষুধ এতদিন দেওয়া হয়েছিল তারই ফল ফলতে শুরু করল জলপড়া দেবার সময় থেকে। কিন্তু পরীক্ষা ক'রে দেখার উপায় নেই, তাই জলপড়া ও আরোগ্য দৈবাৎ একসঙ্গে ঘটলেও জলপড়ারই জয় হল। কিন্তু সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে ঐ ফকিরকে দেখেই যেন বিজ্ঞানী হাতে স্বর্গ পেল, বাড়িসুদ্ধ সবাই এক অন্ধকে পেয়ে বেঁচে গেল।

(৩)

দার্শনিকেরাও বুদ্ধির পথে, যুক্তির পথে, চরম সত্য কি জানবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। যাঁরা সত্যের সন্ধান পেয়েছেন যুক্তির পথে, তাঁরা বলছেন সত্য উদ্ঘাটিত হবে একদিন। যাঁরা হাঁফিয়ে উঠছেন, পথ দেখতে পাচ্ছেন না, তাঁরা ইতিমধ্যেই চোখ বুঁজে পথ পেয়েছেন। চোখ খুলে যা পাননি চোখ বুঁজে বলছেন এইতো পেয়েছি। সামগ্রিক সত্য, চরম সত্য তাঁরা জেনেছেন চোখ বুঁজে। এঁরা মিস্টিক। অনেক যুক্তিবাদি বিজ্ঞানীও হাঁফিয়ে পড়ে অবশেষে এই পথ নিয়েছেন। বুদ্ধি দিয়ে নয়, জ্ঞান দিয়ে নয়, শুধু চোখ বুঁজে চরম সত্যের অব্যবহিত উপলব্ধি। বুদ্ধির পরাজয়, কিন্তু নিশ্চিন্ত অব্যাহতি।

(৪)

কিন্তু এ সব রূপক কাহিনী বাদ দিয়ে, আত্মিক দৃষ্টির কথা বাদ দিয়ে, এই

পৃথিবীতেই নেমে আসা যাক। গত শীতে লণ্ডন শহরে যে নিরেট অন্ধকার কুয়াসা হয়েছিল, এমন দীর্ঘকালস্থায়ী মারাত্মক কুয়াসা সেখানে ইতিপূর্বে আর নাকি হয়নি। এই কুযাসায় সবাই অস্থায়ীভাবে অন্ধ হয়ে পড়েছিল। এই সময়ের একটি ঘটনা :

এক ভদ্রলোক ও তাঁব স্ত্রী ভূগর্ভস্থ ট্রেন থেকে নেমে উপবে উঠে বিপন্ন হন। তখন সবাই বিপন্ন, পথ চিনে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। স্বেচ্ছাসেবকরা সে সময় বহু বিপন্নকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু এই দম্পতি সেই মুহূর্তে সম্পূর্ণ দিশাহারা, সাহায্য করবার কেউ নেই। এমন সময় অত্যন্ত কাছ থেকে কে বলল, "আপনারা সাহায্য চান?" কুযাসায সেই নিকটস্থ লোকটিকেও দেখা যাচ্ছিল না।

তাঁবা তাঁদের বাড়ির ঠিকানা বললেন। লোকটি তাঁদেব হাত ধবে অতি দ্রুত নিযে গিযে সেখানে পৌছে দিল।

তাঁবা লোকটিকে অজস্র ধন্যবাদ দিযে অবশেষে প্রশ্ন করলেন, "আপনি এই নিবেট অন্ধকারে কি ক'রে এমনভাবে পথ দেখালেন আমাদেব?"

লোকটি উত্তবে শুধু বলল, "আমি অন্ধ।" (১৯৫৩)

রবীন্দ্রনাথের নৌকায়

চন্দননগর সাহিত্য সম্মিলনীর সঙ্গে ঝড়বৃষ্টিব অভাবিত সম্মিলন সাহিত্যের গুরুতর ক্ষতি না করিলেও সাহিত্যিকদের সামান্য কিছু ক্ষতি করিযাছিল। কিন্তু সম্মিলনীর প্রথম দিন আকাশ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ছিল এবং সেই সুযোগে আমবা কলিকাতা হইতে সমাগত কযেকজন বন্ধু মিলিযা সম্মিলনীর বাহিরে আবও দুইটি ক্ষুদ্রতব কিন্তু (সম্ভবত) মহত্তর সম্মিলনীর বন্দোবস্ত কবিয়াছিলাম।

শ্রীযুক্ত ববীন্দ্রনাথ ঠাকুবেব বক্তৃতা শেষ হইবার পর শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ, তাঁহাব অভিভাষণ পাঠ কবিতেছিলেন। তাঁহার অভিভাষণে এমন একটা সরলতা এবং আন্তরিকতাব সুর ছিল যাহা শুনিয়া মনে হইল আর যাহাই হউক ইঁহাব হাতে ঠকিবার ভয নাই। আন্তবিকতাব সঞ্চার অলক্ষিত-পথে হৃদয হইতে হৃদয়ান্তবে। হৃদয়বান ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসিলে কাহাকেও বলিযা দিতে হয় না যে ব্যক্তিটি হৃদযবান, মন আপনা হইতেই তাহা বুঝিয়া লয।

কালবিলম্ব না কবিযা উঠিযা পড়িলাম। ভাগলপুব হইতে 'বনফুল' আসিয়াছিলেন, তিনিও উঠিলেন এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায, সজনীকান্ত দাস, অমল হোম, অশোক চট্টোপাধ্যায, অধ্যাপক নীহারবঞ্জন এবং আবও অনেকে।

বনফুলেব বিছানায আসিয়া বসা গেল। সেবকগণের তৎপরতার সীমা ছিল না। তাঁহাবা বলেন, কি চাই? কি চাওযা উচিত তাহা জানিতাম না, সুতরাং সর্বত্র যাহা অসঙ্কোচে চাওযা যায তাহাই চাহিলাম। বলিলাম—চা চাই।

এক ঘণ্টা পবে যখন সেখান হইতে উঠিবার চেষ্টা করিলাম তখন দেখি ওঠা অত্যন্ত কঠিন হইযা উঠিয়াছে। হঠাৎ আমাদেব পরস্পরের প্রীতিবন্ধন যে খুব দৃঢ় হইযা উঠিল তাহা নহে, বরঞ্চ ঠিক তাহাব উল্টাটাই হইল। এমন কি আমাদের পরস্পরের সঙ্গে যে কোনো সম্বন্ধ আছে বা ছিল তাহা আর মনেই পড়িল না। শুধু মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটির কথা নূতন করিয়া মনে পড়িতে লাগিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিস্মৃতপ্রায় বঙ্গসাহিত্য লইয়া যে দুই ব্যক্তি গবেষণা করিতেছেন কেবল তাঁহাবাই আমাদের মধ্যে শূন্যোদরঘটিত হতাশায় আত্মচেতন

ছিলেন, কারণ ডাক্তারের আদেশে ইঁহারা উভয়েই শর্করাসম্পর্কিত খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে শর্করার যদি কোনো সম্বন্ধ থাকে তবে তাহারও গবেষণা হয়ত তাঁহারাই করিবেন, আমরা এ বিষয়ে অনধিকারী।

অতঃপর যখন প্রথম আত্মচেতন হইলাম তখন দেখি অমল হোম, নীহাররঞ্জন রায় এবং আমি রবীন্দ্রনাথের হাউস্‌বোটের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে বসিয়া আছি। এইখানে আমাদের দ্বিতীয় সম্মিলন। কবি গেরুয়া রঙের ধুতি, পাঞ্জাবি এবং চাদরে শোভিত হইয়া উদাসভাবে বসিয়া আছেন। মাঝে মাঝে নৌকায় করিয়া ছেলেরা তাঁহার বোটের পাশ দিয়া তাঁহাকে উঁকি মারিয়া দেখিয়া যাইতেছে। কবির সম্মুখে টেবিলের উপর এক টিন চকোলেট। খুব সম্ভব টিনটি খুব কাছেই ছিল, আমাদের পদশব্দে দূরে সরিয়া গিয়াছে। বোটখানির ভিতরটা অতি পরিষ্কার ভাবে সাজানো। এক ধারে রেডিও সেট, অন্য দিকে একটি ছোট টেবিলে কয়েকটা শিশি এবং একটা অপেরা গ্লাস্ আর একদিকে কতকগুলি ইংরেজি বই ও অনিলকুমার চন্দ।

আমাদের প্রাথমিক আলাপ আরম্ভ হইতেই সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ভিতরে প্রবেশ করিলেন। কবি তাঁহার দিকে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "সিনেমা দেখা হল?" সুধাকান্তবাবু অবাক হইয়া বলিলেন, "এখন সিনেমা!" কবি বলিলেন, "চন্দননগরে হয় তো হয়, ঠিক জানিনে।" শুনিয়া সুধাকান্তবাবুর টাক চিক্‌চিক্ করিয়া উঠিল।

কবির সংস্পর্শে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা কবির এই কৌতুকপ্রিয়তার বিষয়ে অবশ্য জানেন। তাঁহার কথা বলার ইহা একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি। কেহ যদি বরাবর তাঁহার কথাগুলি লিখিয়া যাইতে পারিত তাহা হইলে বাংলা সাহিত্য অন্তত হাস্যরসের দিক দিয়া সমৃদ্ধ হইত।

অমলবাবু খাবারের কথা পাড়িলেন। বলিলেন, "এঁরা যা খাইয়েছেন তা ভুলতে পারব না—চমৎকার সব খাবার—বিশেষ ক'রে সন্দেশ আর চম্‌চম্।"

শুনিবামাত্র কবি তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে অনিলকুমারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অনিল, তুমি তো ওখানে বলে এলে আমি খাব না, শুনলে তো?" অনিলবাবু বলিলেন, "ওঁরা খাবার পাঠিয়ে দেবেন।" কবি আশ্বস্ত হইলেন।

ইহার পর সম্মিলনীর কথা উঠিল। নীহারবাবু বলিলেন, "আপনার বক্তৃতা খুব পরিষ্কার হয়েছে।" কবি বলিলেন, "বড় বড় বক্তৃতা কেউ শোনে না; আর সাহিত্য বিষয়ে কিছু বললে সেখানে লোকও বেশি আসে না। এর

সঙ্গে সিনেমা দেখালেই তো পারে—ধর, এর সঙ্গে যদি 'আলিবাবা' দেখানো হ'ত!"

আমি বলিলাম, "আপনার কন্‌ভোকেশনের বক্তৃতা না কি এত স্পষ্ট হয়েছিল, বিশেষ ক'রে ব্রডকাস্টিংএর পক্ষে, যে ওঁরা ছ'খানা রেকর্ডে আপনার বক্তৃতা ধরে রেখেছেন।" কবি প্রশ্ন করিলেন, "সবটাই কি নিয়েছে?" আমি বলিলাম, "না, খানিকটা।" কবি তখন বিলাতের গল্প বলিলেন; সেখানেও তিনি শুনিয়াছেন তাঁহার কণ্ঠস্বর ব্রডকাস্টিংএর খুব উপযুক্ত।

ইহার পর গোরা নাটকের কথা তুলিলাম। কবি বলিলেন, আমি উপন্যাসে যা লিখেছি সেই কনসেপ্‌শন নিয়ে স্টেজে কোনো নাটক হওয়া শক্ত—তবে ওরা যেটুকু করেছে তা ভালই হয়েছে।" আমি বলিলাম, "হরিমোহিনীর ভূমিকা আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছে।" কবি বলিলেন, "হ্যাঁ, খুব চমৎকার; কিন্তু আমি দেখলাম পানুবাবুর অভিনয়টা সাধারণের পক্ষে সহজ হয়েছে, দর্শক হরিমোহিনীকে ঠিক সে ভাবে নিতে পারে নি। তা ছাড়া পরেশবাবুর ভূমিকাও খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে।" অমলবাবু বলিলেন, "হরিমোহিনীর চরিত্রের সঙ্গে বাঙালী অতি পরিচিত বলেই ওর মধ্যে বোধ হয় কোনো সৌন্দর্য পায়নি।" কবি বলিলেন "তা হবে।"

আমি বলিলাম, "একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছি, যার যা কিছু বিদ্যা আছে তা এখন হয় সিনেমায় না হয় থিয়েটারে বিক্রি হচ্ছে। যেমন গোরা নাটকে একটা ব্যায়াম সমিতি এসে তাদের ব্যায়াম কৌশল দেখাচ্ছে।" কবি বলিলেন, "নাটকে হঠযোগের কথা থাকলে স্টেজেও হয়তো হঠযোগ দেখতে পেতে।"

এমন সময় বনফুল' তাঁহার সদ্যপ্রকাশিত 'বৈতরণীর তীরে' বইখানা হাতে করিয়া প্রবেশ করিলেন। কবি বইখানা পাইয়া হাসিয়া বলিলেন, "বৈতরণীর তীরে—আমাকে! নামটা ভয়ঙ্কর হে।"

তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পরিমল আর বনফুলে খুব মতের মিল আছে—না?" —উভয়ের নামের অর্থের প্রতি ইঙ্গিত।

এই সময়ে বাহির হইতে কে একজন ছোট্ট একখানি খাতা পাঠাইয়া দিলেন; কবি দূর হইতে খাতা দেখিয়াই বলিলেন, "অটোগ্রাফ চায় বোধ হয়।" অমলবাবু বলিলেন, "সে রকম তো মনে হয় না।" কবি খাতাখানা খুলিয়াই পড়িতে লাগিলেন "Will you please give your autograph—" পড়িয়াই একটি স্বাক্ষর করিয়া খাতাখানা ফিরাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "অটোগ্রাফের খাতা আসতে দেখলে আমি বহুদূর থেকেই বুঝতে পারি।"

অতঃপর বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত সরকার ও হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায আসিলেন। নলিনীকান্ত প্রণাম করিতেই কবি তাঁহার দিকে চাহিয়া তাঁহার নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন—"নলিনাক্ষ—নলিন—"

নলিনীকান্ত বলিলেন, "আমি সেকালের বিজলীব নলিনীকান্ত সরকার।" কবি বলিলেন, "নলিনীকে ভোলবাব সময তো এলো।"—এবারেও কবি নিজের নামের সঙ্গে নলিনী নামের—অর্থাৎ ববির সঙ্গে পদ্মের সম্পর্ক মনে করিযাই কথাটি বলিলেন।

আমি কয়েকখানা ফোটো তুলিলাম। বনফুল বলিলেন, "আমার মেয়ে আপনার মালা গলায দেওযাব একটা ফোটো আপনাব কাছে চেযেছিল।" কবি হাসিযা বলিলেন "তিন চার বছরের মেযেরা আমার গলায় মালা দিতে চায—ঐতো আমার এক দুঃখ।" আমাকে বলিলেন, "আমার বোটের একখানা ছবি নিও, এ আমার বহুদিনের বোট।"

বহুদিনের অর্থাৎ ছিন্ন পত্রে যে বোটের উল্লেখ আছে, যে বোট কুষ্টিযা ব্রিজের নিচে ডুবিবার উপক্রম করিযাছিল এবং যে বোটে বসিয়া কবি 'সাধনা' চালাইতেন ইহা সেই বোট এবং সেই সময হইতে ইহা কবির জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হইযা আছে।

বনফুল হঠাৎ স্মরণ কবিলেন তিনি আসলে ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায। স্মরণ কবিতেই কবির কাছে প্রশ্ন কবিযা বসিলেন," আপনার সঙ্গে আমার একটি আলোচনা আছে, "আপনি হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস করেন?" কবি বলিলেন, "আমার বিশ্বাস খুব গভীর।"—এই প্রসঙ্গে তিনি কি করিযা কয়েকটি কঠিন ব্যাধি হোমিওপ্যাথির সাহায্যে সারাইযাছিলেন সেই গল্প কবিলেন। একটা সেণ্ট ভিটাস্ ডান্স এবং আর একটা মেনিঞ্জাইটিস্।

'বনফুল' কযেকখানা হোমিওপ্যাথি বইএর নাম কবির নিকট হইতে জানিযা লইলেন কবি প্রথমত Pharmco-dynamics নামক বইখানা পড়িতে বলিলেন।

এই সময সম্মিলনীর তরফ হইতে সন্দেশ আসিয়া পৌছিল। কবি খুব খুশি হইযা উঠিলেন। তিনি কিছুক্ষণ পূর্বে সাহিত্য সম্মিলনীতে বলিযা আসিযাছেন, "বাঙালী পরস্পর কুৎসা ক'রে বহু জিনিস নষ্ট করেছে, কিন্তু একটি জিনিস সে প্রাণপণে বাঁচিযে রেখেছে—সে তার সাহিত্য।"—ইহার সঙ্গে আরও একটি শব্দ জুড়িয়া দিলে ঠিক হইত—সাহিত্য এবং সন্দেশ। কেন না সন্দেশের স্বাদ

এখনও অবিকৃত। ইহার পর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা আসিতেই রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইল। তার পরেই উঠিল বাংলা বানানের কথা। চলতি ভাষা সম্বন্ধে কবি কিছু ভূমিকা করিলেন। কলিকাতার উচ্চারণটাই মান্য এবং সে উচ্চারণ ঠিক রাখিতে গেলে শব্দের বানানও ঠিক করা আবশ্যক। কবি শব্দানুগ বানানের পক্ষপাতী। সংস্কৃত বানান যেমন ফোনেটিক, বাংলাও সেই রকম হওয়া প্রয়োজন। হল না লিখিয়া হোল লিখিবার দিকেই তাঁহার ঝোঁক। তিনি বলিলেন, "ইলেক দিয়ে 'হ'ল' আমি লিখতে পারব না।"

আমি বলিলাম, "যখন যে রীতিকে গাল দেওয়া যায় কিছুদিন পরে সেই রীতিটাই স্থায়ী হতে থাকে। শব্দের বেলাতেও তাই। আপনি 'কৃষ্টি' শব্দটার বিরোধী কিন্তু ঐ নিয়ে আলোচনা করতে করতে এখন 'কৃষ্টি' শব্দটা আরও বেশি ক'রে চলছে।—এমন কি আপনার সম্পর্কেই ওটা অনেক জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে।"

কবি হাসিয়া বলিলেন, "কি রকম—অর্থাৎ আমার কৃষ্টি আছে এটা স্বীকার করেছে তো।"

এই সময়ে সজনীকান্ত দাস আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন পুরাদমে তর্ক চলিতেছে। কিন্তু তাহাতে কোনো অসুবিধা হইল না, তিনি মাঝখানেই যোগ দিলেন এবং বলিলেন, "তা হ'লে 'আমি কোরি,' 'আমি বোলি' এইভাবে লিখতে হবে তো?"

কবি জোরের সঙ্গে বলিলেন, "সাহস নেই কেন? তাই লেখাই তো উচিত।"

কবির মতে ফোনেটিক বানান লিখিলে বাংলা শব্দ পাঁচ রকম উচ্চারণের বিভীষিকা হইতে অনেকখানি রক্ষা পাইবে। কবির ইচ্ছা, বাংলাতেও সংস্কৃতের মতো ফোনেটিক বানান চলুক। রবীন্দ্রনাথ সুদীর্ঘকালের সাহিত্য সাধনায় এবং ভাষার ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতায় যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার করিয়া দেখা উচিত। বাংলাভাষাকে বাঁচাইবার জন্য যিনি যেটুকু চিন্তা করিতেছেন সেইটুকুর জন্যই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

'ভেতর' বা 'ওপর' না লিখিয়া কবি চলতি ভাষাতেই 'ভিতর' বা 'উপর' লেখেন। তিনি বলেন বাল্যকাল হইতে যে উচ্চারণে তিনি অভ্যস্ত, সেটাই তাঁহার কাছে সহজ। 'ভেতর' 'ওপর' অনেকে বলেন এবং লেখেন, তিনিও সেটা মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নিজের হাতে ও রকম বানান আসিবে না। উদাহরণস্বরূপ বলিলেন, ম্লান শব্দটা তিনি তাঁহার বাড়ির প্রচলিত উচ্চারণে পড়েন।

ফোনেটিক রীতিতে লিখিলে দাঁড়াইবে 'ম্লানো'। কোন্ এক কবিতায় ম্লান-শব্দের সঙ্গে আন্-এর মিল দেখিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন রাইমিংএ ভুল হইয়াছে।

ছোঁড়া ও ছোড়া লইয়া আলাপ হইল। চারুবাবু বলিলেন, ছোঁড়া মানে বালক, ছোড়া মানে নিক্ষেপ করা। এ বিষয়ে আমাদের মতভেদ হইল। কবি বলিলেনঃ "দুটোতেই আমি চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করি।" তারপর সুনীতিবাবুকে বলিলেন, "তুমি তো এ বিষয়ে বাদশা; কিন্তু কমিটি করলে বানান বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হবে না, একা করতে হবে। তুমি বাংলা শব্দের একখানা অভিধান তৈরি কর, তাতে শব্দার্থ লেখার দরকার নেই, শুধু বানানের জন্য তার ব্যবহার হবে।"

কবির মতে তৎসম শব্দের বানানে প্রচলিত রীতিই রাখিতে হইবে, কেবল তদ্ভব শব্দের যথাসম্ভব ফোনেটিক বানান চালাইতে হইবে।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, একটু একটু বৃষ্টিও হইতেছিল, আমি বোটের ফোটো লইবার জন্য নামিয়া আসিলাম। ফোটো তোলা হইল। তাহার পর বাড়ি ফিরিয়া ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখের এই স্মৃতিটুকু সযত্নে রক্ষা করিবার কাজে মনোনিবেশ করিলাম। (১৯৩৭)

প্রগতি ও দেশলাই

পাড়ায় এক বৃদ্ধ বাস করেন। তাঁর মাথার চুলগুলো যেমন পাকা চুলের নিচের বুদ্ধিও তেমনি পাকা।

লোকে তাঁকে বুড়োদা বলে ডাকে।

বুড়োদার একটিমাত্র দোষ তাঁর সকল গুণকে ঢেকে রেখেছে। সেই দোষ হচ্ছে তাঁর নৈরাশ্যবাদ। সমস্ত ভালর মধ্যে তিনি খারাপ দেখেন, সমস্ত গতির মধ্যে তিনি দুর্গতি দেখেন এবং সকল আনন্দের মধ্যে দুঃখই তাঁর চোখে আগে ধরা পড়ে।

আমরা যখন বলি উন্নতি হচ্ছে, তখন তিনি হেসে বলেন, প্রমাণ কোথায়?

আমরা যখন বলছি পৃথিবী এগিয়ে চলছে, তিনি তখন বলেন, পৃথিবী একই কক্ষে ঘুরছে।

দেশের এত বড় স্বাধীনতা আন্দোলনকেও তিনি সুনজরে দেখতে পারেননি। বলেছেন তোমরা যে স্বাধীনতা চাও, সে স্বাধীনতা পৃথিবীর শতকরা নিরানব্বইটি দেশেরই আছে। তারা এখন অন্য কিছু চায়।

আমরা বলি, এতকাল পরাধীন থেকে আপনি স্বাধীনতার বোধ হারিয়েছেন।

তিনি বলেন, স্বাধীনতা হারালেও বোধ হারাইনি।

আমরা বলি, আমরা যখন স্বাধীনতা পেয়েছি, তখন দেখবেন দেশের চেহারা ফিরে যাবে। দেশের গরিব লোকেরা আর এত গরিব থাকবে না, তারা সুখে থাকবে। তার মানে ভারতবর্ষই সুখে থাকবে। কারণ, ভারতবর্ষ মানেই গরিব ভারতবর্ষ।

তিনি বলেন, স্বাধীনতা বাইরে থেকে যখন আসে তখন বাইরে থেকে এ পরিবর্তন সহজে ঘটানো যায় না। স্বাধীনতা যদি ভিতর থেকে, স্বাধীনতার তাগিদে গড়ে উঠত, তাহলে এতদিন গরিবেরা সুখে থাকার পথে অনেকখানি এগিয়ে যেত।

আমরা বলি, যে পরিকল্পনা আছে আমাদের তাতে বাইরে থেকেও কাজ হবে। এতদিন এ পথে যে বাধা ছিল তা দূর হয়েছে।

তিনি বলেন, পরিকল্পনা হবে কিন্তু কাজ হবে না। কারণ, তার আগে তোমাদের আরও গুরুতর অনেক সমস্যার সমাধান করতে হবে। গুরুতর সমস্যাগুলো বাদ দিয়ে ছোটখাটো ব্যাপারে আগেই হাত দেওয়া চলবে না।

আমরা প্রশ্ন করি, গুরুতর ব্যাপারগুলো কি?

তিনি বলেন, গরিবের অন্ন সংস্থান, গরিবের দুটো পয়সা বাঁচানোর চেষ্টার আগে দেশের যে সব চেষ্টা চলছে এবং খবরের কাগজে যা নিয়ে গুরুতর আন্দোলন হচ্ছে সেইগুলো। ধর, এই কলকাতা শহরে যারা আধপেটা খেয়ে আছে তাদের অবস্থা পরিবর্তনের কাজ অনেকদিন অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু রাজ-পথের ইংরেজী নামগুলো অবিলম্বে না বদলালে দেশের গুরুতর ক্ষতি। গরিবেরা একখণ্ড কাপড় কিনতে র‍্যাশনের দোকানে রোদে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে, ওদের এই দুঃখটা এক দিনে ঘোচানো যায়, কিন্তু এ সমস্যা গুরুতর নয়, গুরুতর সমস্যা হচ্ছে, ভারতীয় পতাকার পাশে একটিও লীগ ফ্ল্যাগ উড়ছে কি না। নুনের দাম দু পয়সা, এককালে ওটা দেশের গুরুতর সমস্যা ছিল, তার জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন হয়েছিল, কিন্তু চোরাবাজারে নুন যখন ছ আনা আট আনা হল, তখন কোনো আন্দোলনই হল না। গরিবের মোটর গাড়ির দরকার নেই, কিন্তু তার প্রতিদিন দেশলাইয়ের দরকার আছে। সেই দেশলাইয়ের জন্য তার প্রতিদিন চোরের দ্বারস্থ হতে হয়—তোমাদের স্বাধীনতা তাকে দুপয়সার নিয়ন্ত্রিত দামে একটি দেশলাইও দিতে পারে না। তাকে চোরের কাছ থেকে, প্রকাশ্য স্থান থেকে, চার পয়সা দিয়েই দেশলাই কিনতে হয়।

কিন্তু চোরাবাজার দমনের তো পরিকল্পনা হচ্ছে।

হচ্ছে তো আট বছর ধরে। পরিকল্পনার কোনো দরকারই হয় না এ সব তুচ্ছ কাজে। সামান্য কল্পনা থাকলেই কাজ হতে পারে। তোমরা স্বাধীনতা পেয়েছ সপ্তাহ দুই—কিন্তু ১৫ই অগাস্টেই এর প্রতিকার হতে পারত। সেদিন তোমরা যে পরিমাণ হুল্লোড় করলে আজ সেই পরিমাণে নিস্তব্ধ হয়েছ। সুতরাং ভেবে দেখ, তোমরা যে হুল্লোড়কে প্রগতি বলছ আমি তার মধ্যে কোনো গতিই দেখছি না। আমার দৃষ্টি ঐ দেশলাইতে নিবদ্ধ।

(১৯৪৭)

স্বর্ণঘটিত

প্রাচীন যুগে মেয়েদের অলঙ্করণের ভার নিশ্চয় মেয়েদের হাতেও অনেকখানি ছিল। সংস্কৃত কাব্যে যে সব অলঙ্কারের পরিচয় আছে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় তার সবগুলির পরিচয় দিয়েছেন—

কুরুবকের পরত চূড়া কালো কেশের মাঝে
লীলাকমল রইত হাতে কী জানি কোন্ কাজে।
অলক সাজত কুন্দফুলে শিরীষ পরত কর্ণমূলে
মেখলাতে দুলিয়ে দিত নব নীপের হার।..

এই বিচিত্র অলঙ্কার যে-কোনো বাগানে হাত বাড়ালেই মিলত। কিন্তু শুধু সৌন্দর্য-বৃদ্ধিই তো নয়, এই প্রাকৃতিক অলঙ্কার সংগ্রহে কোনো মেয়ের পিতা বা বধূর স্বামীকে বিনিদ্ররজনী যাপন করতে হয়নি, ক্যাটালগ সংগ্রহ করতে হয়নি, কষ্টিপাথরে খাঁটি কি মেকি যাচাই করতে হয়নি। সহজ অলঙ্কার, প্রকৃতির হাতের জীবন্ত উপকরণ। এই অলঙ্কার সে যুগের কোনো মেয়ের বিবাহে বাধা সৃষ্টি করেছে এমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই। শকুন্তলার তো অলঙ্কার দূরের কথা, একখানা গাবহাটি, মাদ্রাজী অথবা ঢাকাই শাড়িও ছিল না। বল্কল পরেই দিন কাটত। অথচ সে মহারাজের পদমর্যাদাসম্পন্ন স্বামী লাভ করেছিল। দুষ্মন্তের পণের দাবী ছিল না, কিন্তু করতে পারতেন। বলতে পারতেন পঞ্চাশ মণ কুরুবক চাই, পঁচিশ মণ লোধ্র রেণু চাই ইত্যাদি। কিন্তু পণের কথাই ওঠেনি, কেন-না ফুলের অলঙ্কার ছিল প্রকৃত সৌন্দর্যবৃদ্ধির সহায়ক, আর সৌন্দর্যবৃদ্ধির সহায়ক কোনো বস্তুকে কখনো কেউ সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করতে পারে না, যেমন পারে সোনাকে, কেন-না সোনা ফুলের মতো সৌন্দর্যবৃদ্ধি করে না।

ফুলের অলঙ্কার কোমল, কিন্তু সোনার অলঙ্কার কঠিন। কোমল অলঙ্কার কোমলাঙ্গীরাই আবিষ্কার করেছে, কিন্তু কঠিন অলঙ্কার উদ্ভাবন করেছে পুরুষ। ফলে অলঙ্কার সমস্যাটাই ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। রূপবৃদ্ধির জন্যই যদি সোনা প্রয়োজন হত তা হলে তা নারীর কানে, গলায়, হাতে, এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিয়ে থাকত যাতে সৌন্দর্য থেকে সোনাকে পৃথক ক'রে দেখা চলত না। সে অলঙ্কার দেখে সবাই এমন মুগ্ধ হত যে কোন্ দোকানে, কত ভরি সোনায়, কি মজুরীতে তৈরি সে প্রশ্ন মনে জাগত না। যে চোখ নারীর প্রধান সৌন্দর্য

তা দেখে যেমন তার দামের প্রশ্ন ওঠে না। কোনো কঠিনতম বরের পিতাও কনের পিতার কাছে এমন দাবী করতে পারেন না যে যৌতুক স্বরূপ পাঁচ হাজার কি দশ হাজার চোখ চাই।

বলা বাহুল্য সোনার অলঙ্কার আমাদের সমাজে সৌন্দর্যের স্তর পার হয়ে সম্পত্তির স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে। তার মানে সৌন্দর্যের আদর্শের পরিবর্তন ঘটেছে। সোনা যদি সৌন্দর্যবৃদ্ধির উপকরণ হত তা হলে তার একটা পরিমাণ-সীমা থাকত। তা হলে ধনী দরিদ্র হিসাবে সেই পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটত না। বর্তমানের চোখে যার দশ ভরি সোনা আছে সে পাঁচ ভরির চেয়ে দ্বিগুণ সুন্দরী, যার পঞ্চাশ ভরি আছে সে দশগুণ বেশি সুন্দরী। এই কৃত্রিম সৌন্দর্য মাপের উপর নির্ভর করে। বিপরীত মাপে চীনা নারীর পায়ের মতো। যার পা যত ছোট তাকে তত বেশি সুন্দরী বলা হত।

কৃত্রিম সৌন্দর্যের পরিমাণ-জ্ঞানহীনতার জন্যও সম্ভবত পুরুষই দায়ী। বিচিত্র ডিজাইনের ক্যাটালগ সেই তৈরি করেছে, বুঝতে পারে নি যে ভবিষ্যতে এর ফল ভোগ করতে হবে তাকেই। কোনো সৌভাগ্যবান নববিবাহিত হয় তো নব-অনুরাগের আতিশয্যে পত্নীর আপাদমস্তক সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছিল, সেই থেকে সোনার পরিমাণই প্রেমের এবং পরে সম্পত্তির মান রূপে দেখা দিয়েছে। বলা যায় "দাম্পত্যের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী স্বর্ণদণ্ড রূপে।" এবং আরও এক ধাপ পরে "কনের পিতার প্রাণ-দণ্ড রূপে।"

তারপর থেকেই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে মেয়েদের মধ্যেও। কে কত অলঙ্কার পরে বাইরে বেরোতে পারে তার প্রতিযোগিতা। কারণ, সোনা এখন মূলতঃ সৌন্দর্যও নয়, সম্পত্তিও নয়, (সম্পত্তি হলেও নিষ্ফলা সম্পত্তি, বৃদ্ধি নেই ক্ষয় আছে)—অন্য মেয়ের ঈর্ষা উদ্রেকের কৌশল মাত্র। সত্যই সম্পত্তি হলে তা বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ ক'রে বেড়ানোর মধ্যে কোনো রুচির পরিচয় নেই বটে, কিন্তু আনন্দ আছে।

তুমি পুরুষ, কলকাতা শহরে তোমার দশখানা বাড়ি আছে, কিন্তু তুমি কি সেই দশখানা বাড়ির দলিল সর্বদা সর্বাঙ্গে ঝুলিয়ে রাখ? তোমার নিজের বেলায় অন্তত কিছু রুচিবোধ আছে বলতে হবে, কেননা তুমি তা কর না। কিন্তু তুমিই তোমার স্ত্রীকে তার নিজস্ব সকল সম্পত্তি সর্বাঙ্গে ঝুলিয়ে বেড়ানো সমর্থন কর, এমন কি উৎসাহ দাও। স্ত্রীর আনন্দেই কি তোমার আনন্দ?

তুমি বলবে বুকে, পিঠে, পেটে, দলিল ঝুলিয়ে বেড়ালে পুরুষকে সবাই

পাগল বলবে। আমি বলি তোমার স্ত্রীর অঙ্গে আধসেব সোনা ঝোলালে রুচিবান তাকেও পাগল ভাববে, কিংবা তোমাকে। আধসের সোনায় যদি কোনো নারীর সৌন্দর্য বাড়ে তা হলে তাতে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট হবে চোর কিংবা ডাকাত। স্ত্রীব অলঙ্কাবে চোর ডাকাত মুগ্ধ হোক এই কি তোমাব লক্ষ্য?

কিন্তু এ প্রশ্ন বৃথা। কাবণ, সোনাব মোহ থেকে মেয়েদের মুক্ত করা এখন আব পুরুষেব সাধ্য নয। রামাযণেব সীতা হবিণেব তুর্দশায বিচলিত হযেছিলেন, কাবণ হবিণটি ছিল সোনাব। তা ছাড়া বাবণ সীতাকে হরণ ক'বে সোনার লঙ্কায নিযে গিযেছিল, এব মধ্যে কি কোনো ইঙ্গিত নেই? সোনার লঙ্কায না নিযে আন্দামানে নেওযায বাধা ছিল কি?

রামাযণের এই স্বর্ণমৃগ এবং স্বর্ণলঙ্কাই তো মেয়েদেব স্বর্ণাকর্ষণেব মূলে। সীতার এই স্বর্ণপ্রীতি বাম বুঝতেন, তাই তিনি সীতাব শ্রেষ্ঠ স্মৃতি গড়েছিলেন স্বর্ণসীতাব দ্বাবা। বাম অবশ্যই বুঝেছিলেন সীতাব আত্মা এতে তৃপ্ত হবে।

এ যুগে আমবা মেয়েদেব সম্মুখে তুটি আদর্শ ধবেছি—সীতা ও সাবিত্রী। তাই মেযেবা সোনা ও স্বামী তুটিকেই ভালবাসে। আরও স্পষ্ট ক'বে বললে সোনাব জন্যই স্বামীকে ভালবাসে। অন্য কথায, ও-তুটিকেই তাবা অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার কবে।

সুতবাং সোনার সঙ্গে সৌন্দর্যবৃদ্ধিব কথা নিতান্তই ছল। প্রমাণ এই যে, বযসের সঙ্গে সৌন্দর্যবৃদ্ধি যখন থেমে যায, সোনাতেও যখন আর এঁটে ওঠা যায না, তখন মেযেবা ছল পবিবর্তন কবতে থাকে। সৌন্দর্যের ছুতো ক'রে তখন আর সোনা চাওযা যায না। তখন কন্যাব ভবিষ্যৎ সংস্থানের নামে কিছু অলঙ্কার গড়িয়ে নেওযা যায়। বলা বহুল্য, সে অলঙ্কাব কন্যাব মাযের গাযেই ঝুলতে থাকে। তুর্ভাগ্যবশত কন্যা যাঁর নেই তাঁবও ছলেব অভাব হয না। তখন সৌভাগ্যবতীবা চওড়া নেকলেসেব উপব দেবদেবতাব নাম খোদাই ক'বে নেন। লোবেব আব কিছু বলবার থাকে না, একেবাবে সোনাব অক্ষবে "হরেরাম হরেবাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ হবে হবে"! মন্দিবে দেবতাকে সোনা দিযে মোড়াব পরিবর্তে সোনাকেই দেবতা বানানো। ভক্তিব সুবর্ণ দৃষ্টান্ত। কবির কথা বদলিযে বলা যায -'দেবতাবে সোনা কবি সোনাবে দেবতা।'

সোনাব এই মোহ মেযেদের এমনই মজ্জাগত যে সোনাব বাজার দর যে বর্তমানে ছয গুণ বৃদ্ধি পেযেছে তা নিযে কোনো আন্দোলন নেই। তুটাকার কাপড় বাবো টাকা হযেছে ত' নিযে কত ক্ষোভ ও বিক্ষোভ, কিন্তু কুড়ি

টাকার সোনা এক শ কুড়ি টাকা হওয়াতেও কোনো চাঞ্চল্য নেই। সোনা দেখানো আটকাচ্ছে না কি না। লোহার উপর সোনার পাত মুড়ে কাজ চলে যাচ্ছে। সোনাও আবার এমনি ধাতু যে যত পেটো তত পাতলা হবে।

যে কোনো মেয়ে তাই বলতে পারে তুমি যদি বিশগাছা চুড়ি হাতে দিতে পার, আমিও পারি। তোমার চুড়ি নিরেট সোনার, আমার চুড়ি সোনার পাতে মোড়া লোহার। কিন্তু বাইরে দেখে তোমার বোঝবার উপায় নেই। তাই তুমি ভাবছ আমারগুলোও নিরেট, আর তোমারগুলো যে সোনার পাতে মোড়া লোহার তা কি কেউ ভাবছে না? সেইখানে তুমি ঠকছ দুদিক দিয়ে। প্রথমত নিরেট সম্পত্তি ক্ষয় করছ, এবং অনেকে বিশ্বাস করছে না যে ওগুলো নিরেট সোনার।

এই জটিলতা সহজে মিটতে পারে যদি সবাই দেহ থেকে স্বর্ণবাহুল্য কমায়। অলঙ্কার দূর হলেই অহঙ্কার ও ঈর্ষাও দূর হতে পারে।

কিন্তু এ আশা নিতান্তই দুরাশা। কেননা জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ এড়াবার জন্য যেমন নিরস্ত্রীকরণ নীতি সবাই মুখে মানে, কাজের বেলায় অস্ত্র বাড়াতে থাকে, তেমনি আন্তঃস্ত্রীক ঈর্ষা এড়াবার জন্যও নিঃস্বর্ণীকরণ নীতি কোনো স্ত্রী কাজে মানবে বলে বোধ হয় না। সুতরাং কাজের কথা এই যে আগামী আসন্ন বিশ্বযুদ্ধ বাধার আগেই আরও কিছু অলঙ্কার গড়িয়ে রাখা ভাল।

(১৯৫১)

বিজয়ার নমস্কার

সামাজিক প্রথা রক্ষা মাঝে মাঝে বেশ হাস্যকর হয়ে ওঠে। ইংরেজী চিঠি লেখার রীতিতে অনেক সময় এর বেশ দৃষ্টান্ত মেলে। যেমন কোনো ভদ্রলোক কোনো জোচ্চোরকে লিখছেন চিঠি, সে চিঠিতে তাকে যাচ্ছেতাই গাল দেওয়া হয়েছে, অথচ সম্বোধন করা হচ্ছে "প্রিয় মহাশয়" বলে। যে লোকটি সেই মুহূর্তে সবচেয়ে অপ্রিয় তাকে শুধু রীতি রক্ষার জন্য "প্রিয়" সম্বোধন করা অবশ্যই হাস্যকর। কিংবা কোনো সরকারী চাকুরিয়াকে উচ্চপদস্থ কর্মচারী বরখাস্ত করছেন, তবু চিঠিতে নাম সই করার আগে লিখছেন, "আপনার সর্বাপেক্ষা অনুগত ভৃত্য হবার সম্মান-প্রাপ্ত শ্রীঅমুক।"

কিন্তু শুধু বিদেশের চিঠিতে কেন, আমাদের দেশের চিঠিতেও এ রকম হওয়া যে সম্ভব তার একটি দৃষ্টান্ত আমার জানা আছে। এক ভদ্রলোক কলকাতা শহরে পূজোর বাজার ক'রে দেশে ফিরে যান, কিন্তু কিছুদিন পরে আবিষ্কার করেন যে দোকানদার তাঁকে কতকগুলো জিনিসে বেশ ঠকিয়েছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ক্যাশমেমো থেকে দোকানীর ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে তাকে চিঠি লিখতে বসলেন।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, ঘটনাটি যে গত মহাযুদ্ধের পূর্বেকার তা সহজেই বোঝা যায়, কেননা আজকের দিন হলে কারো চুরি বা জোচ্চুরিতে কেউ বিস্মিত হত না, ওটা অত্যন্ত স্বাভাবিক দৈনন্দিন ঘটনা বলে মেনে নিত।

কিন্তু সে কথা যাক। সেই ভদ্রলোক জিনিস কিনেছিলেন আত্মীয় স্বজনকে উপহার দেবার জন্য। কিন্তু যখন আবিষ্কার করলেন দোকানদার ঠকিয়েছে তখন পুনরায় কলকাতা এসে তা ফিরিয়ে দেবার বা বদলে নেবার সময় ছিল না। কিন্তু তবু তিনি দোকানীকে প্রাণ খুলে গাল দিয়ে মনের জ্বালা মেটানোর ব্যবস্থা করলেন।

পূজো মিটে গেছে। বিজয়াও পার হয়েছে, সুতরাং অবসর পাওয়া গেছে বেশ। তিনি লিখতে লাগলেন, মহাশয়, আপনার দোকান থেকে গত ষষ্ঠীর দিন যে সব জিনিস কিনেছি তার দাম আপনি দেড়গুণ বেশি নিয়েছেন। আমি আগে বুঝতে পারিনি, পরে এখানে ফিরে এসে দেখলাম, এই মফঃসলের বাজারেও ও সব জিনিস আপনাদের চেয়ে শস্তায় পাওয়া যায়। ক্যাশমেমোটি

এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি, দেখলেই বুঝতে পারবেন কি ভাবে আপনি আমার গলায় ছুবি বসিয়েছেন।

আপনি একজন পয়লা নম্বব চোর, আপনি প্রকাশ্য দোকানে বসে লোক ঠকিয়ে খাচ্ছেন, আপনাকে পুলিসে দেওযা উচিত। কি বলব, আপনি আমাব নাগালের বাইবে, নইলে আপনাকে জুতিযে লম্বা কবতাম। শালা ডাকাত।

আপনি আমার বিজযাব নমস্কাব জানবেন।

ইতি—শ্রীভবতোষ প্রামাণিক।

(১৯৫১)